ঠাকুর হরিদাস

দ্বিতীয় পর্য্যায়

প্রথম সংস্করণ

শ্রীনিতাইপদ দাস বাবাজী

ঠাকুর হরিদাস

দ্বিতীয় পর্য্যায়

প্রথম সংস্করণ

নির্য্যাণতিথি

১৩৯০

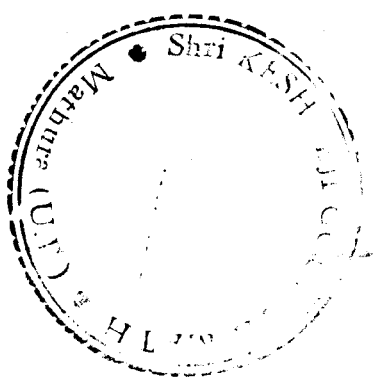

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীনিতাইপদ দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সংকলিত

প্রকাশক
শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর ট্রাষ্ট
শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ
স্বর্গদ্বার, পুরী

সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত

সেবানুকূল্যে—৭·০০

মুদ্রাকর
মদন প্রধান
সারদামাতা প্রেস
১৬, সিমলা ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৬

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ
স্বর্গদ্বার ; পুরী।
শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫

মঙ্গলাচরণম্

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

অদ্বৈত-প্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ো
নিত্যানন্দসখঃ সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মীপ্রাণপতির্গদাধররসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদঃ স দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে।
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তে শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী।
সানন্দং মধুপর্কসম্ভৃতিবিধৌ বেধা করোত্যুদ্যমং
বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ব্রূমঃ কিমন্যৎপরম্॥

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

———

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ॥

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

সমর্পণম্

পরম আরাধ্যতম শ্রীগুরুদেব নামময় জীবন বৈষ্ণবাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের আস্বাদন
ভাণ্ডারে ঠাকুর হরিদাস নামে এই
শ্রীগ্রন্থ সমর্পিত হইলেন।

শ্রীগুরুপদাশ্রিত

শ্রীনিতাইপদ দাস বাবাজী

নিবেদন

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গহরি ভক্তবাৎসল্যের চরম আদর্শ স্থাপন করিলেন ঠাকুর শ্রীহরিদাসের নির্য্যাণ লীলায়। অনন্তগুণের আকর শ্রীভগবান্। কিন্তু তাঁহার কোন গুণেরই আদর থাকিতো না যদি এই ভক্তবাৎসল্য গুণটী না থাকিতো। শাস্ত্রে শ্রীভগবানের সম্বন্ধে যে সকল গুণের কথা শুনা যায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় জনসাধারণ তাহা প্রত্যক্ষ করিল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, শ্রীভগবানই জীবের অতি আপনজন। তবে কত আপনজন তাহা জানা যাইতো না যদি শ্রীগৌরাঙ্গ ভূতলে না আসিতেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ভূতলবাসী নরনারীগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া শিব বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সুদুর্লভ গোপী-প্রেম যদি না বিলাইতেন। এমনভাবে কোন যুগে কোন অবতার জীবের জন্য কাঁদেন নাই বা তাঁহাদিগকে এমনভাবে প্রেমদান করিতে গিয়ে বিভোল হৃদয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করেন নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমদান লীলার সঙ্গে নামদান লীলাও অভূতপূর্ব্ব। তিনি স্থাবর জঙ্গমাদি সকলপ্রকার জীবকেই নামরসে মাতাইলেন। কি অদ্ভুত কথা—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।"

ঝারিখণ্ড বনের সকলপ্রকার পশুপক্ষীকেই তিনি কৃষ্ণনাম লওয়াইয়া কৃষ্ণপ্রেমে নাচাইলেন।

এই নাম প্রচারে নামনিষ্ঠ ঠাকুর হরিদাস নামের মহিমা প্রত্যক্ষ প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিরতিশয় প্রীতিভাজন হইলেন। হরিদাসের পৃষ্ঠে যবনকৃত বেত্রাঘাত তিনি নিজের পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়া সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করিলেন। রৌদ্রবৃষ্টি হইতে হরিদাসকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের ইচ্ছাবৃত্তিকে এক বিশাল বকুল বৃক্ষ-রূপে পরিণত করিয়া ভক্তের জন্য ভগবান্ কত কাতর তাঁহার নিদর্শন দেখাইলেন। শেষে হরিদাস যাহা যাহা ইচ্ছা করিলেন তাহা পূরণ করিতে প্রভু কোনই দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার মৃতদেহ কাঁধে করিয়া প্রভু নৃত্য করিলেন। নামকীর্ত্তনরত ভক্তগণ পরিবেষ্টনে তাঁহাকে বিমানে বসাইয়া সমুদ্রে স্নান করাইয়া স্বহস্তে বালুকা দিয়া তাঁহার সমাধি রচনা করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে নিজ আঁচল পাতিয়া মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া বৈষ্ণব সেবা করিলেন। অতএব

প্রভু গৌরহরি হরিদাসের নির্য্যাণ লীলায় ভক্তবাৎসল্যের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

করুণাঘনবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পুরীধামে শ্রীহরিদাসের এই নির্য্যাণ লীলা প্রতিবৎসর কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধারায় মহোৎসব করিয়া অগণিত নরনারীর মনে ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ লীলা প্রত্যক্ষের মত জাগ্রত করিলেন। বর্ত্তমান সেই ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন বাবাজী মহারাজের আশ্রিত পাঠবাড়ী আশ্রমের সেবকবৃন্দ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদের ভাষায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এবং তাঁহার প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা করিয়া শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীপাদের ভাষায় জগন্মঙ্গল-মঙ্গল শ্রীনামের জয় ঘোষণা করি।

"নমামি হরিদাসং তং
চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং
স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥"
জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেঃ
বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস—**বাবাজী বৈষ্ণব চরণ দাস**

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ	বাল্যকাল ...	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	বেনাপোলের সাধন কানন ...	৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	প্রথম অগ্নি পরীক্ষা ...	১০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ	চাঁদপুরের আশ্রম কুটীর ...	২১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ	শ্রীঅদ্বৈত ও হরিদাস ...	২৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ	ফুলিয়ায় প্রেমোন্মাদ ...	৩৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ	অগ্নিপরীক্ষা (কারাবরণ কারাবাস) ...	৪২
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ	বিচারালয় ...	৪৭
নবম পরিচ্ছেদ ঃ	দণ্ডবিধান ...	৫৩
দশম পরিচ্ছেদ ঃ	অভ্যর্থনা ...	৫৯
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ	নবদ্বীপে ও গৌর আবির্ভাবে ...	৬৪
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ	গৌরের প্রকাশলীলায় ...	৬৭
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ	নাটকাভিনয়ে ...	৮৩
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ	যুগধর্ম্ম নাম সকীর্ত্তন প্রচারে ...	৯২
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ	গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণে ও নীলাচল গমনে ...	৯৮
ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ	নীলাচলে বিজয় প্রসঙ্গে ...	১০১
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ	শ্রীরূপ প্রসঙ্গে—ঠাকুর হরিদাস ...	১০৫
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ	নীলাচলে শ্রীসনাতন প্রসঙ্গে—ঠাকুর হরিদাস ...	১১০
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ লীলা ...	১১৫
বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ	"ঠাকুর হরিদাস" মঠের ইতিহাস ...	১২১

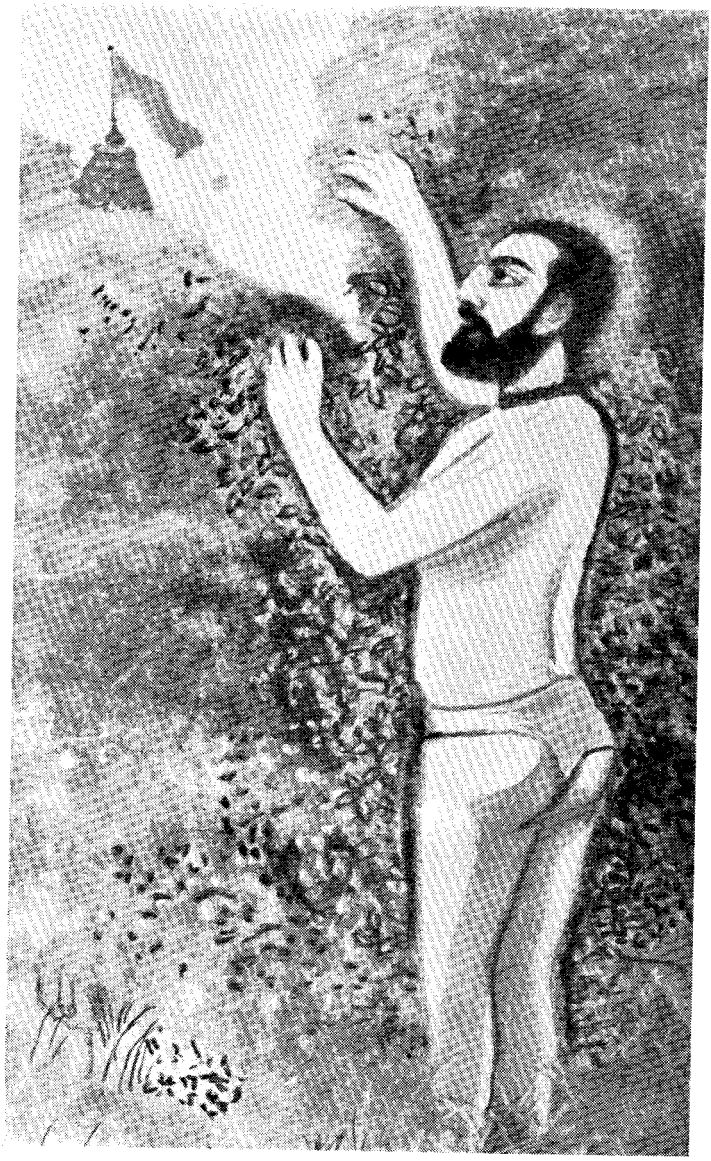

"শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর"

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল

বর্ত্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার অন্তর্গত বনগ্রামের অনতিদূরে বুঢ়ন নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। হরিদাস ঠাকুর সেই বুঢ়ন গ্রামে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"বুঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে সৌভাগ্যে সে-সব-দেশে কীর্ত্তন-প্রকাশ॥"

চৈঃ ভাঃ-আদি-১১।

তিনি কতকাল পিতৃগৃহে ছিলেন, কিরূপে কোন্ স্পর্শমণির স্পর্শে তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথা এখন কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। মুসলমানের পক্ষে হিন্দুধর্ম আশ্রয় করিয়া ভক্ত-চূড়ামণি বলিয়া পরিগণিত হওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার। ভারতের ইতিহাসে মুসলমান রাজাদের প্রভাবে শত সহস্র হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল একথা সত্য, কিন্তু মুসলমানের অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া এবং হিন্দু সমাজের সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া হিন্দু সমাজের অঙ্কে কোনও মুসলমান আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জানি না। এরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলেও বিরল। ভক্তকুল-চূড়ামণি প্রহ্লাদ দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পিতা ও শিক্ষক কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। দেবর্ষি নারদের কৃপায় প্রহ্লাদ বাল্যকাল হইতে 'বিষ্ণুভক্ত'। তাঁহার পিতার কঠোর উৎপীড়ন ও শাসন এবং শিক্ষকের কুশিক্ষা তাঁহাকে ভগবৎ শরণাগতি হইতে তিল মাত্র ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ঠাকুর হরিদাস বঙ্গদেশে দ্বিতীয় প্রহ্লাদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রহ্লাদের ন্যায় তিনি সকল অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুণ্য প্রতিভা তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, তাঁহার চরিত্রের বল ও মাধুর্য্য, তাঁহার বিনয় ও দৈন্য, তাঁহার অতুলনীয় দয়া, ক্ষমা ও তিতিক্ষা তাঁহাকে প্রহ্লাদের আসনে উন্নীত করিয়া রাখিয়াছে। প্রহ্লাদের কথা বেদ ও পুরাণের; কিন্তু ঠাকুর হরিদাসের কথা পঞ্চদশ শতাব্দীর। ইহা ঐতিহাসিক চরিত্র। ঠাকুর হরিদাসের জীবনের মহত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বৈষ্ণব মহাজনগণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অমৃতময় চরিত্রের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে ঠাকুর হরিদাস হিন্দুকুলেই জন্মগ্রহণ করেন। নতুবা মুসলমানের ঘরে এরূপ আদর্শ হিন্দু ভক্ত ঋষির জন্মগ্রহণ অসম্ভব। কিন্তু এ অনুমানের কোনও ভিত্তি নাই। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস স্পষ্ট লিখিয়াছেন ঃ—

"জাতি কুল সর্ব নিরর্থক বুঝাইতে,
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।
অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়,
তথাপি সেই-ই সে পূজ্য সর্ব শাস্ত্রে কয়।
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে,
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে।
এই সব বেদবাক্যের সাক্ষ্য দেখাইতে,
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে।।"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১১)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

"জাতিকুল নিরর্থক বুঝাবার তরে
ঠাকুর হরিদাস জন্মিলেন যবনের ঘরে।।" (শ্রীচরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তবাণী—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

তৃণ হইতেও নীচ হইয়া বৃক্ষ সদৃশ সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অভিমান

ত্যাগ করিয়া, অপরকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্বদা হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবে—এ বাণীর মূর্ত্তরূপ শ্রীহরিদাস। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর হরিদাসের ভগবদ্‌দর্শন বর্ণনাকালে তাঁহার দৈন্য মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

"প্রভু বলে উঠ উঠ মোর হরিদাস!
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥"

চৈঃ ভাঃ, মধ্য-১০ম

ভাব-বিহ্বল ঠাকুর হরিদাস আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন—

নির্গুণ অধম সর্ব জাতি—বহিষ্কৃত।
কি বলিব প্রভু! তোমার চরিত॥
দেখিলে পাতক মোরে, পরশিলে স্নান।
মুই কি বলিব প্রভু! তোমার আখ্যান॥"

চৈঃ ভাঃ, মধ্য-১০ম

হরিনদী গ্রামে দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ যখন ব্রাহ্মণসভার সমক্ষে ঠাকুর হরিদাসকে বলিলেন—

"কার্ শিক্ষা হরি নাম ডাকিয়া লইতে?
এই ত পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে॥"

চৈঃ ভাঃ আদি-১১

"হরিদাস বলিলেন—ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান হরিনামের মাহাত্ম্য॥"

চৈঃ ভাঃ আদি-১১

এখানে নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া আক্রমণকারীকে সম্মানপ্রদর্শন করিয়া উত্তর দিলেন।

জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল দেশের সকল জাতির সকল সমাজের সাধু মহাজন আমাদের নমস্য, আমাদের পূজনীয়। ঠাকুর হরিদাস

মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের বিস্মৃত প্রায় উদার ধর্মকেই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর হরিদাসের পিতামাতার সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক ছিল, কি রূপে তিনি গৃহ ত্যাগ করেন, ঐ সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনগণ নির্বাক্। ঠাকুর হরিদাস ভক্তি শাস্ত্রে প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য ও ভক্তিময় হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হয়ত কোন ভক্তচরিত বা কোনও ভক্তি-গ্রন্থ দৈবাৎ অধ্যয়ন করিয়া ভাবে উন্মত্ত হইয়া সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈরাগী ভক্তদের পদানুসরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর হরিদাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার সময় অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বঙ্গদেশে আসিয়া অনেককে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মাধবেন্দ্রের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চৈতন্যবল্লভ দত্ত ও শ্রীলঅদ্বৈত আচার্য্যের সমবয়স্ক ব্যক্তিরা সকলেই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন সমস্ত ভক্ত বৈষ্ণবই সাক্ষাৎ কিম্বা গৌণভাবে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর হরিদাসও সেইরূপ মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলিয়া অনুমান করা একান্ত অসঙ্গত নয়। সমসাময়িক লোকেরা যখন তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনায় বিরত রহিয়াছেন, তখন আজ পাঁচশত বৎসর পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনার জন্য ঐতিহাসিক কিতিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আর এক কথা, ভগবৎপ্রাণ বৈষ্ণবদের 'কৃষ্ণদাস' অভিমান ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে ও পরে চতুর্দিকে শত শত বৈষ্ণব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যে কেহ যে কোনও দেশে যে কোনও সমাজে জন্মগ্রহণ করিলে সে দেশও সে সমাজকে ধন্য করিয়া মহাপুরুষোচিত যশ ও গৌরব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের অল্প লোকেই তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় জীবনের খবর রাখে। চতুর্দিক হইতে নদী সকল আসিয়া যেমন মহা-

সমুদ্রের মধ্যে আপনাদের বারির-প্রবাহ ঢালিয়া দেয়, শ্রীগৌরসুন্দরের শত শত মহাপ্রাণ পারিষদবর্গ সেইরূপ আপনাদের পবিত্র জীবনধারা 'চৈতন্য-সমুদ্রে' উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনটি প্রেমের ধারা, কোনটি শান্তির ধারা, কোনটি বৈরাগ্যের ধারা, কোনটি বা পুঞ্জীভূত পুণ্য প্রবাহ। মহাপ্রভুর প্রচারিত 'হরিনাম' যজ্ঞে জীবন আহুতি দান করা ভিন্ন তাঁহাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। সেই প্রয়োজন সাধন কে কতটুকু করিয়াছেন তাহার প্রতিই কেবল লক্ষ্য করা উচিত। তথাপি ঠাকুর হরিদাসের সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজেকে লুকাইত রাখিতে যত্ন করিতেন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে জীবনব্যাপী অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মহত্ত্বকে খাঁটি সোনা বলিয়া সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ অতি আশ্চর্য্য অগ্নি-পরীক্ষোত্তীর্ণ জীবন-চরিতে কোথাও অবান্তর কথা নাই। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই কেবল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের উৎস।

ঠাকুর হরিদাসের ইহ-জগতে আবির্ভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য

(১) শ্রীবরহরিদাস কৃত 'অদ্বৈত বিলাসে' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি সংখ্যা—২৭৪) পরিশিষ্ট ৩১৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে শ্রীহরিদাস ঠাকুর ১৩৭২ শকে অগ্রহায়ণ মাসে খানউল্লা কাজির গৃহে অবতীর্ণ হন এবং কয়েক মাস পরেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন।

(২) কেহ কেহ ইঁহাকে 'ব্রহ্ম হরিদাস'ও বলেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত গো-বৎস-হরণকারী ব্রহ্মাই অপরাধ ক্ষালনের জন্য যবন কুলে জন্ম লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় সহচর হইয়াছিলেন।

(৩) গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা মতে—ইনি ঋচীক মুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা ও হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্তরাজ প্রহ্লাদ।

(৪) মুরারী গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায় যে কোন মুনির পুত্র অযোনি তুলসী পত্র দেওয়ায় পিতৃকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া—যবন কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

(৫) শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের মতে—শ্রীরাধিকার দশমী দশায় যাঁহারা কৃষ্ণ নাম শুনাইয়া 'লীলা' রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন—গৌর লীলায়—'ঠাকুর হরিদাস'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেনাপোলের সাধন কানন

বেনাপোল এখন শিয়ালদহ-খুলনা রেললাইনের অন্তর্গত একটি সুপরিচিত ষ্টেশন। বেনাপোলের যে মাঠের উপর দিয়া রেললাইন চলিয়া গিয়াছে তাহা এখনও 'হরিদাসের মাঠ' বলিয়া খ্যাত।

ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় বেনাপোলের সাধন কাননে। এই বেনাপোল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ঠাকুর হরিদাস অকৃতদার। তিনি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বেনাপোলের গহন বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি উচ্চৈঃ স্বরে এমন সুমধুর ধ্বনিতে হরিনাম উচ্চারণ করিতেন যে, লোকের প্রাণে তাহা সঙ্গীতের ন্যায় সুখজনক হইত। তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন শুনিবার জন্য দিবসের প্রায় সময়ই বহুলোক তাঁহার আশ্রমের অদূরে বসিয়া থাকিত। তিনি সমস্ত দিন নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে এরূপ প্রেমসিন্ধুনীরে মগ্ন হইতেন যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইতেন, কিরূপে দিন অতিবাহিত হইত তাহা তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। সূর্যাস্তের প্রাক্কালে বন হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণের বাটী হইতে অন্ন ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ঠাকুর হরিদাসের নিয়ম ছিল প্রতি মাসে এক কোটি নাম করিবেন। সুতরাং প্রতিদিন তিন লক্ষেরও অধিক 'নাম' না করিলে তাঁহার সংখ্যা পূর্ণ হইত না ইহা দিবামানে দ্বাদশ ঘটিকায় অসম্ভব। ঠাকুর হরিদাস এই নিমিত্ত আবার আসনে বসিয়া সন্ধ্যাকালে নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন এবং যতক্ষণ না তাঁহার সেই সঙ্কল্পিত সংখ্যা পূর্ণ হইত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ধ্যান-স্তিমিত মহাযোগীর ন্যায় উপবিষ্ট থাকিতেন।

ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ৩য়

নির্জন বনে কুটির করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন॥

হরিদাসের হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি মনে করিতেন একবার মাত্র হরিনাম শ্রবণ করিলে মানুষের কথা দূরে থাকুক পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত অনায়াসে মুক্তি লাভ করে। পশু পক্ষীরা হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারে না; তাহারা হরিনাম শ্রবণ মাত্রই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার শ্রীমুখোক্তি—

"শুন, বিপ্র! সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণ নাম,
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
পশু, পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে,
শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে।
জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে,
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে।
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ,
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি ১১শ অধ্যায়

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হরিদাস! কলিকালে মুসলমানেরা গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে। ইহাদের কিরূপে নিস্তার হইবে?" ঠাকুর হরিদাস উত্তর করিলেন—"প্রভু, কিছু চিন্তা করিও না, যবনদের দুঃখে দুঃখী হইও না।"

"যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হারাম হারাম' বোল কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হা রাম' 'হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম॥
অজামিল পুত্র বোলায় বলি 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥

'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥
নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হইলেও না ছাড়ে আপন প্রভাব ॥
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব পাপক্ষয়,
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাঁহা অজামিল সাক্ষী ॥"

চৈ, চ, অন্ত্য, ৩য় অধ্যায়

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীভগবন্নামের মহামহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। স্বাধীন গৌড়ের নৃপতি হুসেন শাহ তাঁহার স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি পূর্বহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার মুখে বদনার পাণি (করোয়ার জল) দিয়া তাহার জাতি নাশ করাইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায় সেই দুঃখে দেশ ত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেলেন। সেখানে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে তপ্ত ঘৃত মুখে ঢালিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। সুবুদ্ধি মর্মাহত হইয়া গঙ্গাজলে প্রাণ ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এই উপদেশ দেন যে মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল—

"এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে,
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।"

চৈ, চ, মধ্য, ১১

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপী হ'য়ে তত পাপ করিবারে নারে ॥"

বস্তু হইতেও নাম বড়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের নাম বড়, একথা সত্যভামার উপাখ্যানে সুন্দররূপে দেখানো হইয়াছে। সত্যভামা ব্রতের দক্ষিণা স্বরূপ নারদকে কৃষ্ণ দান করিয়াছিলেন। নারদ কৃষ্ণকে লইতে

উদ্যত হইলে মহিষীগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন, কৃষ্ণের সমান ওজনের ধনরত্ন দিলে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিবেন। এক পাল্লায় দ্বারকার সব রত্ন ও মহিষীদের সব অলঙ্কারাদি রাখিলেও কৃষ্ণের ওজনের সমান হইল না। উদ্ধব আসিয়া বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন আমা হইতে আমার নাম বড়। তোমরা ধন রত্ন সব নামাও। উদ্ধব একটি তুলসী পত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া রত্নাদির পরিবর্ত্তে তুলসী পত্রটি রাখিলে

নীচে হইল তুলসী ঊর্দ্ধেতে জগন্নাথ।
সেইজন্য, শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ নাম ধন বড়।
জপহ কৃষ্ণ নাম চিত্ত করি দৃঢ়॥ (কাশীরাম দাস)

বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই শ্লোকরত্নটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারংবার উচ্চারণ করিয়াছেন,—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

আর ঠাকুর হরিদাস এই হরিনামকেই সাধন পথের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আজীবন এই নাম যজ্ঞে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞের আরম্ভ বেনাপোলের সাধন কাননে, আর পূর্ণত্ব পুরুষোত্তমে—

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভু বসাইল।
নিজ নেত্র দুই-ভৃঙ্গ মুখ-পদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সব ভক্ত পদ রেণু মস্তকে ভূষণ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ বলে বার বার।
প্রভু মুখ মধু পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করি উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥"

চৈ, চ, অন্ত্য, ১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অগ্নি পরীক্ষা

রামচন্দ্র খান বনগ্রাম অঞ্চলের তদানীন্তন ভূম্যধিকারী। কবিরাজ গোস্বামী তাহাকে বৈষ্ণবদ্বেষী পাষণ্ডপ্রধান বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার অধিকারের মধ্যে শত শত লোক প্রতিদিন হরিদাস ঠাকুরের চরণতলে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে অবনত হইত, রামচন্দ্র খানের পক্ষে ইহা বড়ই অসহনীয় বোধ হইল। সাধুদ্রোহী ঈর্ষাপরায়ণ রামচন্দ্র খান হরিদাস ঠাকুরকে অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র খানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ঠাকুর হরিদাসের নিষ্কলঙ্ক সুমিষ্ট ও উদার চরিত্রে কোথাও কোন প্রকার দোষ বাহির করিতে পারিল না। তাহাতে নীচাশয় রামচন্দ্র খান নিরাশ হইল না, বরং মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিল—সংসারের তীব্রতম প্রলোভন ঠাকুর হরিদাসের সামনে ধরিয়া তাঁহার চরিত্রে পাপের প্রবেশ দ্বার উন্মোচন করিবে।

রমণীর রূপলাবণ্যে মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদের মন পর্য্যন্ত চঞ্চল হইতে দেখা গিয়াছে, রমণীর রূপে মহাযোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে, সাধু মহাজনের চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে। রামচন্দ্র খান মনে করিল পৃথিবীতে এমন কোন্ সাধু আছে যাঁহার হৃদয় অসাধারণ রূপবতী যুবতীর রূপ লাবণ্যে টলিবে না? তাই সে বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী গণিকাগণকে একত্রিত করিল।

"কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে—এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্ম-নাশ॥

বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে—তিন দিবসে হরিব তার মতি॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

রামচন্দ্র খান গণিকার আশ্বাস বাক্য শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তাহার আর বিলম্ব সয় না। তিন দিনের কথাটা তাহার ভাল লাগিল না, তাহার ইচ্ছা ঐ মুহূর্তেই হাতে হাতে সাধু হরিদাসকে কুক্রিয়ান্বিত অবস্থায় ধরিয়া আনে।

"খান কহে—মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥"

চৈঃ চরিতামৃত, অন্ত্য ৩য় পঃ

রমণী রামচন্দ্র খানের অপেক্ষা বেশী বুদ্ধি রাখিত। সে বলিল, ইহা কি সম্ভবপর? আমি যাইব আর হরিদাসের ন্যায় সাধু আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া ফাঁদে পড়িবেন? তাঁহার সঙ্গে আগে আমার সঙ্গ হউক, পরে তুমি তোমার পাইক পাঠাইও।

"বেশ্যা কহে—মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়ে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

এইরূপ কথোপকথনের পর সেই সুন্দরী যুবতী সুযোগের অন্বেষণে রহিল এবং সেইদিন রাত্রিকালে বিবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া উল্লসিত চিত্তে ঠাকুর হরিদাসের সাধন কাননের নৈশ সৌন্দর্য্য ও নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। যুবতী হরিদাসের চরিত্র জানিয়া আশ্রম মর্য্যাদা রক্ষা করিল। সে প্রথমতঃ হরিদাসের কুটীর প্রাঙ্গণের তুলসীতলায় প্রণাম করিল, দেখিতে পাইল সম্মুখে পবিত্র উজ্জ্বল অতি সুন্দর এক দিব্য শ্রীমূর্তি উপবিষ্ট হইয়া হরিনাম করিতেছেন। বেশ্যা তাহাকে প্রণাম করিল। বেশ্যা যে কর্ত্তব্যভার স্কন্ধে লইয়া বেনাপোলের পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে, প্রথমতঃ তাহার সেইকর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। হরিদাসের ধর্মমতি

ভ্রষ্ট করিবার জন্য সে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল এবং নিজ অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পূর্ণরূপে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই ঠাকুর হরিদাসের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

বক্ষস্থলাদির কাপড় সরাইয়া বেশ্যা ঠাকুর হরিদাসের কুটীরের দুয়ারে বসিল। তারপর সুমধুর স্বরে কহিতে লাগিল—

"ঠাকুর! তুমি পরমসুন্দর প্রথমযৌবন—
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন?
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

শ্রীবৃন্দাবন দাসও ঠাকুর হরিদাসের রূপ বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"আজানুলম্বিত ভুজ, কমল নয়ন।
সর্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপম॥"

চৈঃ ভাঃ, আদি ১১শ

হরিদাস ব্রহ্মচারী, চিরকুমারব্রতধারী, তপস্বী ও নবীন ভক্ত। যে পরীক্ষায় জগৎপূজ্য শত শত যোগী ঋষি ও সাধু মহাজনগণের পদস্খলন হইয়াছে, যে পরীক্ষায় মহাযোগীর যোগ ভঙ্গ হইয়াছে, আজ সেই পরীক্ষা নবীন ভক্ত ঠাকুর হরিদাসের নিকট উপস্থিত। কিন্তু হরিদাস যে কেবল স্থির অচল অটল ছিলেন তাহা নহে, তিনি রমণীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, বেশ্যার প্রতি ঘৃণাও প্রদর্শন করিলেন না। যিনি নামামৃতসিন্ধু মধ্যে অষ্টপ্রহর নিমগ্ন হইয়া থাকেন, তাঁহার নিকট মোহ কি ছার! যিনি অহোরাত্র শ্রীহরির রূপসাগরে নিমজ্জিত থাকেন তাঁহার নিকট রমণীর রূপ লাবণ্য নগণ্য। যিশু যখন শয়তান কর্ত্তৃক

প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, Get thee behind me Saitan শয়তান আমার পশ্চাৎ দূর হ। ঠাকুর হরিদাস শয়তানের দূত, শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি গণিকাকে দূর করিয়া দিলেন না। পুরুষসিংহ শাক সিংহের নিকট 'মার' উপস্থিত হইয়া যখন তাঁহাকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিল তখন তিনি সিংহবিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—

"বরং পর্বতরূপ মেরু স্থানভ্রষ্ট হইবে, সমগ্র জগৎ শূন্যে মিশিয়া যাইবে, আকাশ হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে, এই বিশ্বে যত জীব আছে সকলে এক মত হইবে, মহাসাগর শুকাইয়া যাইবে, তথাপি এই যে বৃক্ষমূলে আমি বসিয়া আছি এখান হইতে আমাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবে না।"

যোগীবর ঈশার ভ্রুকুটি, বুদ্ধদেবের পুরুষকারপূর্ণ অভূতপূর্ব হুঙ্কার খুবই বিস্ময়কর এবং শিহরণকর,। কিন্তু ঠাকুর হরিদাসের ব্যবহার ততোধিক আশ্চর্য্য ও মনোমুগ্ধকর! ভক্তবীর হরিদাস শয়তানের শক্তিকে লেশমাত্রও অনুভব করিলেন না। তিনি শয়তানকে পরাস্ত করার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে ভগবানের করুণার অধিকারী করিয়া ভগবানের পাদপদ্ম রূপ পরম পদ দিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"

সেইজন্য যখন পিশাচী পূতনা ধাত্রীরূপে স্তনে কালকূট মাখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে গিয়াছিলেন, তখন পরম কারুণিক ভগবান তাঁহাকে ধাত্রীর শোভনীয় পরম পদ দান করিয়াছিলেন। এ করুণার তুলনা নাই। পূতনা যখন পাপের শেষ সীমায় অবস্থিত হইয়াছিল, যখন তাহার পরিত্রাণের শেষ আশার প্রদীপটি নিভিয়াছিল, তখন ভগবানের করুণা তাহার উদ্ধারের জন্য মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল।

রামচন্দ্র খানের প্রেরিত গণিকাও যখন নরকের শেষ সীমায়

উপস্থিত হইয়া সর্বজনপূজ্য ভক্ত-চূড়ামণি হরিদাসঠাকুরের বৈরাগ্য ধর্ম নষ্ট করিবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন পরম কারুণিক ঠাকুর হরিদাস তাহার প্রতি মনুষ্যোচিত বিদ্বেষ ঘৃণা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে করুণাময় ভগবানের একবিন্দু করুণা আস্বাদন করাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম যাবৎ সমাপ্ত না হয় আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তি হইলে করিব যে তোমার মন॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

গণিকা অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল।

হরিদাস নাম সঙ্কীর্ত্তনে আত্মবিস্মৃত হইলেন। দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া যাইতে লাগিল, ভক্ত-আদর্শের অবধি ঠাকুর হরিদাস উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। বেনাপোলের বনে ঠাকুর হরিদাসের সাধন কাননে লোহিতরূপে রবির কিরণ প্রতিফলিত হইল। অগত্যা বেশ্যা ঠাকুর হরিদাসকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্র খানের নিকটে গিয়া বলিল, "হুজুর! নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই; সাধুর আশ্বাসে বুঝিয়াছি, আজ তিনি আমার সঙ্গ করিবেন।"

আজি আমায় অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

রামচন্দ্র খান শুনিয়া আনন্দিত হইল। পরদিন রাত্রে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহাকে পুনরায় ঠাকুর হরিদাসের নিকট পাঠাইল।

আর দিন রাত্রি হৈল, বেশ্যা আইলা।
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস কৈলা।

কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লৈবা মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার ॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হইলে পূর্ণ হবে তোমার মন ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

দ্বিতীয়দিন রাত্রিতে বেশ্যাকে নিজ সাধন কাননে দেখিয়া ঠাকুর হরিদাস অতি বিনয়নম্র বচনে কৃপা পূর্বক তাহাকে বলিলেন—

"কল্য রাত্রিতে তুমি বড়ই কষ্ট পাইয়াছ। সমস্ত রাত্রি তোমাকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছে; শুইতে পার নাই, তাহাতে তোমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। আশায় আশায় বসিয়া রহিয়াছ, তোমার আশাও কল্য পূর্ণ করিতে পারি নাই, তাহাতে তোমার আরও কষ্ট হইয়াছে। গতরাত্রির তোমার সমস্ত কষ্টের মূলেই আমি; তজ্জন্য আমার কোনও অপরাধ লইবে না। আমি নিশ্চই তোমাকে অঙ্গীকার করিব, ইহাতে অন্যথা হইবে না। যে পর্য্যন্ত আমার সংখ্যা নাম পূর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তুমি এখানে বসিয়া আজও নাম সঙ্কীর্ত্তন শোন।" বেশ্যা তখন ঠাকুর হরিদাসের মধুর ভাষায় একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তুলসীদেবীকে প্রণাম করিয়া কুটীরের দ্বারে বসিয়া হরিনাম শ্রবণ করিতে লাগিল। আজ বেশ্যা নিজেও মাঝে মাঝে 'হরি' 'হরি' বলিতেছে। দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইল, কিন্তু ঠাকুর হরিদাসের নাম শেষ হয় না। বেশ্যা দেখিল রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়াছে। সারারাত্রি বসিয়া থাকা ইন্দ্রিয়বিলাস নিরতা বেশ্যার পক্ষে যে কি কঠোর ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝা যায়। সে তখন উদ্বিগ্ন হইয়া উসি পুসি করিতে লাগিল। ঠাকুর হরিদাস দেখিলেন বেশ্যার চিত্ত বড় চঞ্চল হইয়াছে। দয়ার্দ্র হৃদয় ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার মানসিক অবস্থা অনুভব করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন—

"কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করিয়ে এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি রাত্রি হল শেষে ॥

আজি সমাপ্ত হবে হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল॥
কালি সমাপ্ত হৈবে তবে ব্রত ভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

বেশ্যা ঠাকুর হরিদাসের কথায় আশ্বস্ত হইল। রামচন্দ্র খানের নিকট গিয়া সকল কথা বলিল। রামচন্দ্র খান বলিল "আবার যাও, শিকার ছাড়িও না।" তৃতীয় সন্ধ্যাকালে পুনরায় সে ঠাকুর হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইল। পূর্ববৎ তুলসী ও হরিদাস ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া দ্বারে বসিয়া নাম কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে 'হরি হরি' বলিতে লাগিল। ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—"আজ আমার নাম সংখ্যা পূর্ণ হইবে। তখন তোমার বাসনা পূর্ণ করিব (অর্থাৎ আমার নাম পূর্ণ হইলে তোমার যে বাসনা (অভিলাষ) হইবে তাহা আমি পূর্ণ করিব; অথবা আমার নাম পূর্ণ হইলেই তোমারও বাসনা পূর্ণ হইবে। যখন হৃদয়ে আর কোনও বাসনার উদয় হয় না, তখনই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়। হরিদাস ঠাকুরের উক্তির মর্ম্ম এই যে, আমার নাম পূর্ণ হইলে তোমার চিত্তের এমন একটি অবস্থা হইবে যে তোমার চিত্তে তখন আর ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত কোনও বাসনাই থাকিবে না। বাস্তবিক হইয়াছিলও তাহাই।

"নাম পূর্ণ হবে আজি' বোলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব আমি তোমার অভিলাষ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

শ্রীভগবানের করুণার উপর হরিদাস ঠাকুরের অটল বিশ্বাস। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে 'নামের' করুণায় পাষাণে কুসুম ফুটিবে, মরুভূমি বারিসিক্ত হইবে।

নাম সংকীর্ত্তন পূর্ণ হইতে হইতে এই দিনেরও রাত্রি শেষ হইল।

রজনীর অন্ধকারের সহিত গণিকার পাপাসক্ত হৃদয়ের ঘোর তমসাও বিদূরিত হইল। তারপর যখন পূর্বদিক্ রক্তিম রাগে রঞ্জিত করিয়া গগনে উজ্জ্বল রবির কিরণছটা ছড়াইয়া পড়িল তখন গণিকার হৃদয়-আকাশে দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়া তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত পাপাবলীর মূর্ত্তি স্পষ্ট ভাবে তাহার মানস পটে প্রকটিত করিল। সেই রমণীর জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল। পরে স্থূল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা তাহার চিত্তপট হইতে দূরীভূত হইল। নিজের আচরণের জন্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল; পূর্বের ঘৃণ্য পাপবাসনার কথা স্মরণ করিয়া তীব্র যাতনা উপস্থিত হইল; হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়া তাহার ভয় হইল।

"কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈলা।
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেলা॥"

চৈঃ, চঃ, অন্ত্য ৩য়

সে আত্মনিন্দাপূর্বক ঠাকুরের চরণতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র খানের প্ররোচনাতেই যে নিতান্ত জঘন্য পাপবাসনা লইয়া হরিদাস ঠাকুরের সর্ব্বনাশ সাধনে সে আসিয়াছিল তাহাও বলিল। আর বলিল,—"ঠাকুর!

বেশ্যা হঞা মুই পাপ করিয়াছোঁ অপার।
কৃপা করি কর মো অধমের নিস্তার॥

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

গণিকার কথা শুনিয়া ঠাকুর হরিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র খানের কথাতেই যে তুমি আসিয়াছ তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। এজন্য তাহার প্রতি আমার ক্রোধও নাই দুঃখও নাই। কারণ সে অজ্ঞ। সে কি জঘন্য কাজ করিতেছে, ইহার কি ফল হইবে তাহা সে জানেনা।

যেদিন রামচন্দ্র তোমাকে এখানে পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছিল, সেই দিনই এই স্থান ত্যাগ করিয়া আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতাম, কেবল

তিন দিন রহিলাঙ তোমা নিস্তার লাগিয়া ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

কি অতুলনীয় নির্ব্বিকার চিত্ত! পাপীর প্রতি কি অগাধ প্রেম! কি দয়া!

কবি গাহিয়াছেন—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।" (মহাকবি কালিদাস)

ঠাকুর হরিদাস পাপীর মুক্তির জন্য তিন দিন যাবৎ বিকারের কারণ সম্মুখে রাখিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা ভিখারী নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী মহাপুরুষ এই মহাপ্রলোভনের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে চান নাই। শ্রীহরির করুণায় ঠাকুর হরিদাসের আত্মবিশ্বাস দৃঢ়। শ্রীভগবানের করুণার উপর ষোলআনা নির্ভর করিয়া তিনি এই কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুর হরিদাসের চরিত্রগৌরবের নিকট মহাযোগী সাধু ভক্তেরা পরম শ্রদ্ধার সহিত মস্তক অবনত করিবেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"উহান যে যোগ্য পদ 'হরিদাস' নাম।
নিরবধি কৃষ্ণ বদ্ধ হৃদয়ে উহান॥
সর্ব্বভূতবৎসল সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি জন্মে অবতারী॥
উঁহো যে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেও হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি-কর্ম্মপাশ॥

হরিদাস-আশ্রয় করিব সেই জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসারবন্ধন।"

চৈঃ ভাঃ, আদি ১১শ

ঠাকুর হরিদাসের সংসর্গে গণিকার অনাদি-কর্ম্ম-পাশ ছিন্ন হইল. সংসার বন্ধন মুক্ত হইল। সে ঠাকুর হরিদাসের শ্রীচরণপ্রান্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিল "ঠাকুর! তুমি আমার গুরুদেব, যাহাতে আমার ভবভয় ক্লেশ দূর হয় সেই উপদেশ কর। হে আমার জীবনের ধ্রুবতারা, তুমি আমার জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দাও"—

"ঠাকুর কহে—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লও, কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য় পঃ

ঠাকুর হরিদাস রমণীকে এই উপদেশ দান করিয়া হরিনাম লইতে লইতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চাঁদপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। কি সৌভাগ্য সেই গণিকার! গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। রাজ-প্রাসাদসম নিজ অট্টালিকা ও অতুল সম্পদ বিলাইয়া দিল। কত যত্নের কত বহু মূল্যের সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা নিতম্বলম্বিত যে কেশের সংস্কার করিত, কত সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে, কত কত বহু মূল্য মণিমুক্তাদি দ্বারা যে কেশের শোভাসাধন করিত, মাথা মুড়াইয়া সেই কেশকলাপ ফেলিয়া দিল। কত বিচিত্র রত্নালঙ্কারে, কত বহুমূল্য বস্ত্রে যাহার অঙ্গ শোভা বর্দ্ধিত করার জন্য শত শত বিলাসী পুরুষ অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে, সে আজ ভিখারিণী সাজিল। কত উপাদেয় চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় বস্তু সর্ব্বদা আহার করিয়াও যে তৃপ্তি লাভ করিত না, আজ সে দুই এক মুষ্টি ছোলা চিবাইয়া কোন দিন বা উপবাস করিয়াই পরম সুখ অনুভব করিতেছে। সর্ব্বদা যাহার সেবার জন্য কত দাসী নিয়োজিত থাকিত,

কত কত গণ্যমান্য পদস্থ লোক যাহার মনোরঞ্জনের জন্য সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত, সুসজ্জিত অট্টালিকায় কত বিলাসসামগ্রী স্তূপের মধ্যে থাকিয়াও যাহার তৃপ্তি হইত না, আজ সে প্রথম যৌবনে এক বস্ত্রে একা হরিদাসের সাধনকাননের পর্ণকুটীরে অরণ্যের মধ্যে বাস করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম ও তুলসীসেবা করিয়াই পরম তৃপ্ত।

"তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে॥" চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

ফলে ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা দূর হইল। হরিনাম করিতে করিতে তাহার হৃদয় আকাশে দিব্য-প্রেমচন্দ্রের উদয় হইল। চতুর্দ্দিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

ঠাকুর হরিদাসের প্রভাবে—

"প্রসিদ্ধ কুলটা হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তারে দর্শনেতে যান্তী॥" চৈঃ চঃ, অন্ত ৪র্থ পঃ

এ জগতে কেহ ছোট নয়, কেহ তুচ্ছ নয়, কেহ অস্পৃশ্য নয়, কেহ ঘৃণার পাত্র নয়। ভগবানের বা ভগবদ্ ভক্তের কৃপা হইলে বারনারীও দেবপূজ্য পবিত্র আসন লাভ করিতে পারে।

'কৃপা কর ওগো হীরা
গুরু বলে ঝুরি মোরা" (শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চাঁদপুরের আশ্রম কুটীর

হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার নামক দুইটি কায়স্থ ভূম্যধিকারী এখনকার হুগলীর অতি নিকটে পুরাতন সরস্বতীর তটে সপ্তগ্রাম নামক সুপ্রসিদ্ধ নগরে গৌড়েশ্বরের বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধির কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রকার সুখসম্পদে পূর্ণ এবং বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ও সুপ্রসিদ্ধ নগর। হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস দুই ভাই এই সপ্তগ্রামের আশ্রয় ও অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। বৈষ্ণব কবিরা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য বলিয়া প্রশংসা করিয়াছে,—(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইভাবে লিখিয়াছেন :—)

"হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
সদাচার, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥" (চৈঃ চঃ)

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের এক পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার নাম বলরাম আচার্য্য। সপ্তগ্রামের অনতিদূরে চাঁদপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বলরাম আচার্য্যের নিবাসস্থল। পুরোহিত বলরাম প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজ বাসস্থলে থাকিয়া ছাত্রদিগকে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশ করিতেন। তাঁহাকে সাধারণ লোকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনও সেইরূপ করিতেন।

হরিদাস ঠাকুর বেনাপোলের কানন পরিত্যাগের পর কয়েকটি গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া শেষে চাঁদ পুরে আসিয়া বলরামের অতিথি হইলেন।

বলরাম তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার আশ্রমের জন্য একটি নির্জ্জন পর্ণশালা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি এই পর্ণকুটীরে আনন্দে বিভোর হইয়া দিবারাত্র তাঁহার হৃদয়-বিহারী শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন এবং দিবসের কোনও এক সময়ে বলরামের গৃহে যাইয়া ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেন।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন কুলপুরোহিত বলরামের কাছে ঠাকুর হরিদাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহাকে চক্ষে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। ঠাকুর হরিদাস কখনও ধনীর নিকট যাইতেন না। কিন্তু মজুমদারের মহত্ত্বের কথা শুনিয়া ও বলরাম আচার্য্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে একদিন বলরামের সহিত মজুমদারের বিরাট সভাদ্বারে উপস্থিত। ঠাকুর হরিদাসের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে জনস্রোত আসিয়া বিরাট সভামণ্ডপ পূর্ণ করিল। মধ্যমণ্ডপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বেষ্টিত হইয়া হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের দর্শন মাত্র তাঁহারা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভক্তির সহিত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিপুল সম্মান প্রদর্শন করতঃ তাঁহাকে বিশিষ্ট আসনে বসাইলেন।

"এক দিন বলরাম মিনতি করিয়া ;
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া ॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

সভায় যে সকল বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ঠাকুর হরিদাসের সৌম্য, শান্ত, দিব্য মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং অশেষ প্রকারে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ঠাকুর হরিদাসকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করেন এ সম্বন্ধে তাঁহাদের (হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের) একটু সংশয় ছিল ; কিন্তু পণ্ডিতদের এতাদৃশ ব্যবহার দর্শনে তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

"অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন,
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন।
হরিদাসের গুণ সভে কহে পঞ্চমুখে,
শুনিঞা দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে।"

চৈঃ, চঃ অন্ত্য ৩য়

পণ্ডিতেরা জানিতেন যে ঠাকুর হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তন করিতেন। এই জন্য তাঁহারা হরিনামের মহিমা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

কেহ বলে—'নাম হৈতে হয় পাপ ক্ষয়'।
কেহ বলে—'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।'

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন রায় রামানন্দকে বলিয়াছিলেন "এহো বাহ্য আগে কহ আর" শ্রীহরিদাসও পণ্ডিতগণকে নামের বাহ্য আনুষঙ্গিক অর্থ ছাড়িয়া মুখ্যার্থের সিদ্ধান্ত করিলেন—

"হরিদাস কহে—নামের এ দুই ফল নহে;
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥
আনুষঙ্গিক ফল নামে—মুক্তি, পাপনাশ;
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

ঠাকুর হরিদাস তাঁহার মনের কথা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শ্রীভাগবত ও বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি বিবিধ পুরাণের বহু শ্লোক আবৃত্তি করিলেন এবং পরিশেষে শ্রীভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত এবং পদ্যাবলীতে ধৃত সুমধুর শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া সকলকে অতি সুন্দর সরল ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা শুনাইলেন।

শ্লোকটি এই:—

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।"

অন্বয়মুখী অনুবাদ—তরণিঃ (সূর্য্য) তিমিরজলধিম্ (অন্ধকার সমুদ্রকে) ইব (যেমন শোষণ করে, দূরীভূত করে, তেমনি) হরেঃ (শ্রীহরির) জগন্মঙ্গলং (জগন্মঙ্গল—জগতের মঙ্গলজনক) নাম (নাম) সকৃৎ (একবার মাত্র) উদয়াৎ এব (উদিত উচ্চারিত হইলেই) লোকস্য (লোকের) অখিলং (সমুদয়) অংহঃ (পাপ) সংহরৎ (সংহার, বিনষ্ট করিয়া) জয়তি (জয়যুক্ত হন।)

ঠাকুর হরিদাসের ইচ্ছা যে সভাস্থ কোন পণ্ডিত এই শ্লোকের বিশদার্থ বুঝাইয়া দেন, কিন্তু ভক্ত-বীরের অসামান্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহারা কেহই তাঁহার সামনে এই ভার গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না।

তখন ঠাকুর হরিদাস নিজেই বলিলেন—

"হরিদাস কহে—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমো হয় ক্ষয়।
চোর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

শ্রীহরিদাস ঠাকুর সূর্য্যের সঙ্গে ভগবন্নামের তুলনা দিয়াছেন। যদিও ভগবানের যেমন তুলনা নাই, তাঁর নামেরও তেমনি তুলনা হয় না তথাপি আমাদের মত অল্পবুদ্ধি ও মায়াবদ্ধ জীব যাহাতে ভগবন্নামের মহিমা কিছুটা অনুভবের মধ্যে আনিতে পারে তাহার জন্য শাস্ত্রকারগণ সকলের অনুভূত সূর্য্যাদি প্রাকৃত বস্তুর সহিত নামের তুলনা দেওয়ার প্রয়াস করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারগণের পথ অনুসরণ করিয়াই ঠাকুর হরিদাস সেই পণ্ডিত সমাজে নামের মহিমা সূর্যোপমায় বলিতেছেন—

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অন্ধকার চলিয়া যায়, ধরা পড়িবার ভয়ে চোর ডাকাতেরা গৃহস্থের বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করে। ভূতপ্রেতগণ মানুষকে ভয় দেখাইবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। আবার সূর্য্য যখন উদিত হন, তখন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মানবগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম, ব্রত, উপনয়নাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এতদ্ ব্যতীত জাগতিক বস্তুগুলিও সূর্য্যালোকে যথাযথরূপে মানুষের চোখে প্রকাশিত হয়।

সূর্য্যের এইরূপ ধর্ম্মগুলি শ্রীভগবানের নামের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি নাম এখনও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করে নাই, করিবার জন্য ইচ্ছা মাত্র করিয়াছে তাহার হৃদয় হইতে পাপরূপ অন্ধকার রাশি পলায়ন করে, মানুষের সদ্‌গুণরূপ রত্নরাজির অপহারক কামক্রোধাদি দস্যুগণও আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া থাকে। দুঃখদায়ক ভোগৈশ্বর্য্যকে সুখদায়ক মনে করা মোহরূপ ভূতপ্রেতাদিও অদৃশ্য হইতে থাকে, আর যখন মানুষ ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে আরম্ভ করে তখন হইতে তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির অনুকূল বৃত্তিরূপ মাঙ্গলিক কাজ আরম্ভ হয়। এই ভাবে নিরন্তর ভগবন্নামের অনুশীলনকারীর প্রেম চক্ষু উন্মোচিত হয় এবং সে পরিণামে ভববিরিঞ্চির বন্দনীয় শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়।

সভাস্থ সকলেই তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে মজুমদারের প্রধান আরিন্দা (যাহারা খাজনা বহন করিয়া নেয় তাহাদের অধ্যক্ষ) সুদর্শন, পণ্ডিত ও যুবক এই ব্যাখ্যা শুনিয়া তাহার মেজাজ গরম হইয়া গেল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুর হরিদাসকে শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং সভাস্থ পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনারা শুনুন, কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি লাভ করা যায় না, এই লোকটি

(যেন আঙ্গুল দিয়া ঠাকুর হরিদাসকে দেখাইয়া বলিতেছে) বলে যে নামাভাসে সেই মুক্তি লাভ করা যায় !"

'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হৈল সহন।
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন ;
ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ !
'কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি না পায় ;
এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয়' ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

হরিদাস কহিলেন,—"ভাই ! তুমি বৃথা সংশয় কর কেন ? হরিনামের আভাস মাত্রেই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্র কথা—আমার মনগড়া কথা নয়। কিন্তু ভক্তেরা ভক্তিসুখের তুলনায় মুক্তিকে অতি তুচ্ছ বস্তু জ্ঞান করেন। ভক্তিজাত বৈচিত্র্যপূর্ণ চমৎকারিতাময় আনন্দের লোভে লুব্ধ হইয়া মুক্তি ভক্তদের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহা স্পর্শ করেন না।"

গোপাল চক্রবর্ত্তী কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া হরিদাসের সঙ্গে বাজি ধরিয়া বলিলেন,—

"বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয় :
তবে তোর নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥

ঠাকুর হরিদাস কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন—

হরিদাস কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয় ;
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয় ॥" চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

নাম মাহাত্ম্যের অবজ্ঞায় এবং পরমভাগবত ঠাকুর শ্রীহরিদাসের প্রতি অবজ্ঞায় অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া সভাস্থ সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শুধু তাই নয়—

মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার।" চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

বলরাম পুরোহিত তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। ঠাকুর হরিদাস নির্ব্বিকার চিত্তে উঠিয়া চলিলেন। মজুমদার নিন্দা ব্রাহ্মণকে

কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং সভাসদগণের সহিত ঠাকুর হরিদাসের চরণ তলে পতিত হইলেন। ঠাকুর হরিদাস সহাস্য বদনে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা সকলে দুঃখিত হইতেছ কেন? তোমাদের কোনও দোষ নাই। এই ব্রাহ্মণেরও কোনও দোষ দেখি না।

তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবেক এই সব তত্ত্ব?" চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

হরিদাস পুনরায় কহিলেন ঃ—

"যাও ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার;
আমার সম্বন্ধে যেন দুঃখ না হউ কাহার॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

ঠাকুর হরিদাসের স্নেহদৃষ্টি আপামর সকলের প্রতি শত্রু মিত্র নির্ব্বিচারে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিত। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অতঃপর লিখিয়াছেন—

"যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল;
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল।
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে,
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে।"

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়)

ঠাকুর হরিদাস সপ্তগ্রামের সভা হইতে বাহির হইয়া কিছুকাল চাঁদপুরের কুটীরে অবস্থান করিয়া বললাম আচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শান্তিপুর চলিয়া আসিলেন।

ঠাকুর হরিদাস যখন বলরামের গৃহে অতিথি ছিলেন, তখন রঘুনাথ নামে একটি পঞ্চদশ-বৎসরবয়স্ক বালক তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল।

রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন॥ (চৈঃ চঃ,)

এই বালক গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র এবং হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন এই উভয় ভ্রাতার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। ঠাকুর হরিদাসের স্নেহ-করুণ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইলে দেখিতে দেখিতে ভক্তি ও বৈরাগ্যের বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। শুধু তাই নয়,—হরিদাস কৃপা করেন তাঁহার উপরে।

সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে। (চৈঃ চঃ,)

তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিবার জন্য অনেক অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি রাত্রিযোগে বারংবার গৃহ হইতে পলায়ন করেন এবং বারংবার সতর্ক প্রহরী তাঁহাকে ধরিয়া আনে। তাঁহার মাতা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, ছেলে উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাকে বান্ধিয়া রাখ।' পিতা উত্তর দিলেন 'যাহাকে ইন্দ্রের সমান ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সদৃশী স্ত্রী বান্ধিতে পারিল না তাহাকে দড়ির বন্ধনে কি করিবে?'

মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের পর ইনি পুরীধামে অবস্থান কালে যেরূপ দৈন্য ও কৃচ্ছ সাধনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন জগতে তাহার তুলনা নাই। জগন্নাথের মন্দিরের পার্শ্বে দোকানে দোকানে যে প্রসাদান্ন বিক্রয় হয় তাহা অনেকেই জানেন। দুই তিন বারে যে সকল অন্ন বিক্রয় হয় না তাহা গরুকে খাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু গরুও যে অন্ন দুর্গন্ধের জন্য গ্রহণ করিত না, তাহা রাজপুত্র রঘুনাথ কুড়াইয়া নিয়া জল দিয়া ধুইয়া খাইতেন। রাজপুত্রের পক্ষে এমন কৃচ্ছ সাধনের তুলনা কোথায়? ধন্য ঠাকুর হরিদাস! তাঁহার ক্ষণিক সঙ্গলাভে রাজপুত্র দীনের দীন কাঙ্গাল সাজিয়া প্রেমের ভিখারী—ব্রজের ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী হইয়াছিলেন। সত্য সত্যই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন, হরিদাসের স্পর্শ করা দূরে থাক তাঁহাকে দর্শন করিলেই নিখিল ভববন্ধন ছিন্ন হয়।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈত ও হরিদাস

চাঁদপুর হইতে শ্রীহরিদাস কেন যে চলিয়া আসিলেন তাহার সামান্য আভাস পূর্ব্বপরিচ্ছেদে জানা যায়, কিন্তু তাঁহার মনের অন্তঃস্থলের পরিচয় মনুষ্যের সাধারণ বোধের অগোচরে রহিল। শ্রীহরিদাস চাঁদপুর থাকিয়া সপ্তগ্রাম ধন্য করিয়া পরে আরও কয়েকদিন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে নদীয়ার শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। একদিন যে ভূমি হইবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের 'আদিপীঠ', নিতাই গৌরের প্রকট বিহার জন্য যে পীঠস্থলী ধরণীর হইবে চিরপূজ্য সেই নবদ্বীপেরই মর্ম্মকেন্দ্র শান্তিপুর ধামে ঠাকুর শ্রীহরিদাস উপস্থিত হইলেন। "শান্তিপুর নবদ্বীপ পৃথিবীর অর্ঘ্য" (বৈষ্ণব মহাজন পদ)।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ কালে বাংলার সমাজ জীবনে আরও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। পশ্চিম বাংলার সমাজকে বেশী পীড়িত করিয়াছিল। তাই করুণাময় শ্রীহরির আবির্ভাব নদীয়াতেই। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীহরির নিত্যপার্ষদবৃন্দের পূর্ব্ব প্রস্তুতির ক্ষেত্রও রচিত হইয়াছিল নদীয়া শান্তিপুর। সেখানে বাস করিতেছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—যাঁর ঈক্ষণ প্রাপ্ত হইলে 'মায়া' ব্রহ্মাণ্ড সৃজনে সমর্থা হন, সেই মহাবিষ্ণু শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীঅদ্বৈত আচার্যারূপে অবির্ভূত হইয়াছেন। এই শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বাল্য ও কৈশোরে নাম ছিল শ্রীকমলাক্ষ। শ্রীকমলাক্ষের পিতা শ্রীকুবের তর্ক-পঞ্চানন। দ্বাদশ বর্ষের পুত্র কমলাক্ষকে লইয়া শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার নব গ্রামের বাস ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আগমণ করেন। পিতার নিকট শ্রীকমলাক্ষ বেদ, তর্ক, সাহিত্য, জ্যোতিষ ও

দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে "বেদপঞ্চানন" উপাধি দান করেন। পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন নব্বই বৎসর বয়সে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে কমলাক্ষ তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হন। দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থান মধ্বাচার্য্য পীঠ উপনীত হইয়া সেখানে "নারদসূত্রাদি" ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ঘটনাক্রমে ঐ স্থানেই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর স্বাভাবিক প্রেমময় মূর্ত্তি ও ভক্তিশাস্ত্রের অসীম দক্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পুরী গোঁসাই সম্বন্ধে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন "মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘ দেখিলেই তিনি হন অচেতন।" শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী 'অনন্ত সংহিতার' একটি ভবিষ্যৎ বাণী উদ্ধৃত করিয়া কমলাক্ষকে বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় আবির্ভাব হইবে অচিরে। এবং তাহা হইবে শ্রীনবদ্বীপ ধামে।" শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্য হইতে বিদায় লইয়া কমলাক্ষ (শ্রীঅদ্বৈত) শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

অকস্মাৎ একদিন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করিলেন। স্বেচ্ছাময় শ্রীগুরুদেবের আগমনে শ্রীকমলাক্ষের আনন্দের সীমা রহিল না। স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিলেন। মধ্যাহ্নে পরমানন্দে ভোগ প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন। পরে শ্রীগুরুদেবকে তাহা অর্পণ করিলেন। প্রসন্নচিত্ত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী সেবায় পরিতৃপ্ত হইয়া একটি দিন মাত্র শ্রীকমলাক্ষের আলয়ে অবস্থান করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। যাইবার সময় শিষ্যকে আদেশ করিয়া গেলেন—

"কৃষ্ণার্থ সংসার কর— বিবাহ করিয়া"

শ্রীগুরুর আজ্ঞায় স্থানীয় কোন ভাদুড়ী উপাধি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের দুই কন্যা সীতা ও শ্রীকে শ্রীকমলাক্ষ বিবাহ করিয়া সংসারী সাজিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণ সমাজে "বজ্রযানী" তান্ত্রিক সমাজের আচার আচরণ ছাড়া বৈদিক হিন্দু সমাজের কোন আচরণই প্রচলিত ছিল না। শ্রীকমলাক্ষ বৈষ্ণব আচরণ ছাড়া অন্য আচরণকে কর্ত্তব্য কর্ম বলিয়া গণ্য

করিতেন না। ইহার জন্য শ্রীঅদ্বৈত ব্রাহ্মণসমাজ কর্ত্তৃক নানা ভাবে উপেক্ষিত হইতেন।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য তান্ত্রিক ক্রিয়াগুলির উৎকট ও বীভৎস পদ্ধতির জন্য গভীর ব্যথা অনুভব করিয়া শ্রীগুরু আনুগত্যে শ্রীহরির চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির আরাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতেন। শান্তিপুর ও নবদ্বীপে দুইটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তিনি প্রধানতঃ ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনায় দিন যাপন করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল প্রাণে শ্রীগুরু ও শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা করিতেন।

সেই প্রার্থনার ফল অচিরেই মিলিয়া গেল। ঠাকুর শ্রীহরিদাস শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং শ্রীঅদ্বৈতকে দণ্ডবত প্রণাম করিলে তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের মিলনে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল। গঙ্গা যমুনার ন্যায় দুইটি জীবনধারা বঙ্গদেশে এক মহাতীর্থের সৃষ্টি করিল।

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য দুই বাহু তুলিয়া অনুগত ভক্তগণকে আশ্বস্ত করিলেন, তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস কর আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি 'শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতেছেন', এই বলিয়া তিনি হুঙ্কার করিতেন, তাঁহার হুঙ্কারে ভক্তগণের অবিশ্বাস ও সন্দেহের মেঘ দূর হইয়া যাইত। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবেন। ঠাকুর হরিদাসও সে প্রতিজ্ঞায় যোগ দিলেন। দুইজনে এই মহাসঙ্কল্প করিয়া মহাযজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন। এমন সঙ্কল্প পৃথিবীতে কেহ কোনদিন করে নাই।

ঠাকুর হরিদাসের সংসর্গ লাভ করিয়া শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর বিশ্বাস উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইল। দুই জনের মন প্রাণ এক হইল।

দুই জনের এক সঙ্কল্প হইল, দুইজন এক ব্রতে ব্রতী হইলেন, এক যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোফায় নামসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে—এই তাঁর মন॥
দুইজনার ভক্ত্যে 'চৈতন্য' কৈল অবতার।
নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার॥" চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

ঠাকুর হরিদাস প্রথমেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য গঙ্গার তটে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য গঙ্গার তটে অতি নির্জ্জন প্রদেশে ঠাকুর হরিদাসকে একটি গোফা অর্থাৎ মৃণ্ময় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঠাকুর হরিদাসের আশ্রম লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেও যোগী ঋষির আশ্রমের ন্যায় শোভা পাইত। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়,—

"জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝলমল॥
দুয়ারে তুলসী লেপা পিণ্ডির উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

এ হেন রমণীয় আশ্রমে ঠাকুর হরিদাস প্রেমে ডুবিয়া থাকিতেন। অপরাহ্নে ভিক্ষার অনুরোধে যখন তিনি শ্রীল অদ্বৈতের গৃহে আসিতেন তখন তাঁহার শ্রীমুখে ভাগবত ও গীতার ভক্তি-রসাত্মক ব্যাখ্যা শুনিতেন এবং দুইজনে মিলিয়া কৃষ্ণকথামৃত আস্বাদন করিতেন।

"গঙ্গা তীরে গোফা করি নির্জনে তাঁরে দিল।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইল॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষানির্ব্বাহণ।
দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন॥" চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে এত দূর আদর ও সম্মান দেখাইতেন যে তিনি দৈন্যে ও লজ্জায় একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িতেন এবং যখন দেখিতেন যে শ্রীঅদ্বৈত শত শত কুলীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর আদর করিতেছেন, তখন তাঁহার মনে আশঙ্কা হইত, হয়ত তাঁহাকে সম্মান করিতে গিয়া শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য কোনও মতে সমাজে বিড়ম্বিত হইবেন। এই জন্য তিনি অদ্বৈতকে অতি দীনভাবে সামাজিক আচার উপেক্ষা না করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

"হরিদাস কহে—গোসাঞি! করোঁ নিবেদন,
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন?
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীনসমাজ,
নীচে আদর কর, না বাসহ ভয় লাজ?
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে বাসোঁ ভয়,
সেই কৃপা করিবে, যাতে তোমার রক্ষা হয়।"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৫

বৃদ্ধ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য আজ হইতে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী লো তদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা এখনকার কোন পক্ষে সহজসাধ্য নহে। বৃদ্ধ আচার্য্য সামাজিক ব্যবহারে বৎসর পূর্ব্বে যে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও বীরত্ব দেখাইয়াছি তুলনা আমাদের ইতিহাসে বিরল।

"আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
'তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজ
তিনি যে কেবল মুখে একথা বলিলেন ত
যথার্থতা প্রতিপাদন করিলেন।

"এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাই
'মাতৃশ্রাদ্ধের পাত্রটি' একজন
অদ্বৈত আচার্য্য ঠাকুর হরিদাস

পাত্রটি দান করিলেন। ঠাকুর হরিদাসকেও আচার্য্যের ঐকান্তিক অনুরোধ ও প্রীত্যর্থে অত্যন্ত দীনভাবে অগত্যা তাহা গ্রহণ করিতে হইল। শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ সমাজ ইহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। একদল লোক ঠাকুর হরিদাসকে পথে বিপন্ন করিবার জন্যও প্রস্তুত হইয়া রহিল। তাহারা ভাবিল, ঠাকুর হরিদাসকে যথোচিত শাস্তি দিয়া হিন্দু সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। একদিকে 'অপরাধী' শ্রীঅদ্বৈত আর একদিকে 'অপরাধী' ঠাকুর হরিদাস। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রতিপত্তিশালী লোক। তাঁহাকে অপদস্থ করা যাহার তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সিংহের গর্জ্জনে যেমন শৃগালের দল আতঙ্কিত হয়, বিক্রমকেশরী শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কারেও তেমনি নীচাশয় লোকের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইত। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস নিতান্ত নিরীহ। তাঁহাকে প্রহার করিলে তিনি নিজের বেদনার জন্য বেদনা অনুভব করেন না বরং আততায়ীর দুঃখে দুঃখিত হন। এহেন লোকের শাস্তি বিধান করিতে বীরত্বের প্রয়োজন হয় না। তাই ব্রাহ্মণদল শ্রীহরিদাসের গমনের পথে সুসজ্জিত হইয়া রহিল। তাহারা কোনও দিন ঠাকুর হরিদাসকে দেখে নাই, কেবল তাঁহার নাম শুনিয়াছে। ঠাকুর হরিদাস যখন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন তাহারা দেখিল, সামনে এক দেবদুর্ল্লভ দিব্য মূর্ত্তি। এমন মহাপুরুষ তাঁহারা কখনো জন্মেও দেখেন নাই। সূর্য্যের উদয়ে যেমন মেঘ কাটিয়া যায়—ঠাকুর হরিদাসের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন মাত্র সেইরূপ তাহাদের হৃদয়ের পাপ বাসনা দূর হইয়া গেল। তাহারা অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ঠাকুর হরিদাসের চরণতলে পতিত হইয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। ঠাকুর হরিদাস সকলকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া এবং সস্নেহ আশীর্ব্বাদে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাপুরুষদের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি যে তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্রেই লোকের সৌভাগ্যোদয় হয়। মহাপুরুষের পুণ্যজ্যোতিঃ যাহার নেত্রকে আকৃষ্ট করিয়াছে সেই ধন্য। উক্ত ঘটনার পর ঠাকুর হরিদাস ভাবিলেন

শান্তিপুরে আর বেশীদিন থাকা উচিত নয়। প্রাণের সুহৃদ্ অদ্বৈতাচার্য্যও তাঁহার জন্য বিশেষ কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে পারেন এইরূপ আশঙ্কায় ঠাকুর হরিদাস শান্তিপুরের আশ্রম ছাড়িয়া 'ফুলিয়া' অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শান্তিপুরের গঙ্গাতীরের আশ্রমে অবস্থান কালে তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রের এক অলৌকিক ঘটনা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিতে গিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পাঠকগণকে অনুরোধ করিয়াছেন।

"তর্ক না করিহ, তর্ক অগোচরে তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি॥

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এ ঘটনা আমি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শুনিয়াছি। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী 'কড়চায়' এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। ঘটনাটি এই,—

একদিন জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে দশদিক উদ্ভাসিত। গঙ্গার লহরীর উপর সুধাংশু- অংশুমালা বিচ্ছুরিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। জাহ্নবীজল-ধৌত শ্রীহরিদাসের আশ্রম কুটীরের শোভা বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। লেপাপিণ্ডির উপর তুলসীবৃক্ষ কুটীরের দ্বারে বিদ্যমান। এমন সময়ে এক অপরূপ যুবতী রমণী অঙ্গনে প্রবেশ করিল। তার অঙ্গের কনক-কান্তিতে সেই স্থানটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত হইল, অলঙ্কারের মধুর শব্দে দশদিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই অলৌকিক রূপ-লাবণ্যবতী রমণী আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে তুলসীকে নমস্কার করিল, তুলসী পরিক্রমা করিয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া যোড়হাতে হরিদাসের চরণ বন্দনা করিল, তারপর সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর! তুমি জগতের নমস্য ও আরাধ্য, তুমি রূপবান্, গুণবান্, তোমার সহবাসের জন্য এখানে আগমন করিয়াছি। সদয় হইয়া আমাকে গ্রহণ কর। দীনের প্রতি দয়া সাধুর স্বভাব।

আমার ন্যায় দীনজনে দয়া কর। এইরূপ বলিয়া এতাদৃশ কামোদ্দীপক ভাবসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিল যাহাতে মুনিদিগেরও ধৈর্য্য নষ্ট হয়। রমণীর হাবভাব দেখিয়াও ঠাকুর হরিদাসের চিত্তে কোনও রূপ বিকার উপস্থিত হইল না। নির্ব্বিকার গম্ভীরাশয় ঠাকুর হরিদাস সদয় হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, আমি নিয়ম পূর্ব্বক প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তন করি। নাম সংখ্যা পূর্ণ না হইলে আমি অন্য কাজ করিনা, ইহাই আমার নিয়ম। নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলে অন্য কাজ প্রয়োজন মত করিতে পারি। দ্বারে বসিয়া তুমি নাম সংকীর্ত্তন শুন। নাম সমাপ্ত হইলে যাহাতে তোমার প্রীতি হয় তাহা করিব। ইহা বলিয়া ঠাকুর হরিদাস নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রমণী দ্বারের প্রান্তে বসিয়া নাম শুনিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি অবসান হইল। প্রাতঃকাল দেখিয়া রমণী উঠিয়া গেল। এইরূপে সে তিন দিন যাতায়াত করে এবং এরূপ হাবভাব দেখায় যাহাতে ব্রহ্মারও মন হরণ করে। তৃতীয় রাত্রি শেষে ঠাকুরের নিকট নারী কহিতে লাগিল "তুমি আমাকে আশ্বাস দিয়া বঞ্চনা করিলে! রাত্রি যায় দিন যায়—তথাপি তোমার নাম সমাপ্ত হয় না!"

"হরিদাস ঠাকুর কহে —আমি কি করিব?
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িব?" (চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়)

রমণী ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বলিল আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। আমি "মায়া"।

"তবে নারী কহে তারে করি নমস্কার—
আমি 'মায়া' করিতে আইলাঙ পরীক্ষা তোমার॥"
"ব্রহ্মাদিজীবেরে আমি সভারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণ-নাম শ্রবণে॥

চিত্ত মোর শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপাকর মোতে ॥ চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

মায়া ভগবানের 'নিত্য-দাসী'। পতিতপাবন পরমকরুণ গৌরসুন্দরের আবির্ভাবে জগৎ প্রেমবন্যায় ভাসিয়া যাইবে সেকথা তাঁহার জানা আছে। তাই তিনি বলিতেছেন—

"চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হইল ধন্যা ॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে কভো তার নাহিক নিস্তার ॥"

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

মায়াদেবী পুনরায় বলিলেন—

পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে ;
তোমাসঙ্গে লোভ কৈল কৃষ্ণনাম লৈতে।
মুক্তিহেতু 'তারক' ব্রহ্ম হয় রামনাম ;
কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে—করে প্রেমদান।
কৃষ্ণনাম দাও তুমি মোরে কর ধন্যা ;
আমারেও ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা।" চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

মায়া পরম আর্ত্তির সহিত তাঁর মনের কথা ঠাকুর শ্রীহরিদাসের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। 'বন্দিল হরিদাসের চরণ'।

ঠাকুর হরিদাস মায়ার নিবেদন শুনিয়া সস্নেহে বলিলেন—

'কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন'

বৈষ্ণবগণ ঠাকুর হরিদাসকে 'মায়ার গুরু' বলিয়া বন্দনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব মহাজন মুখে শোনা আছে,—মায়া ঠাকুর হরিদাসকে অপূর্ব্ব গুরু দক্ষিণা দিয়াছেন—

'যে তোমার স্মরণ লয়, তারে মোর নাহি দায়'

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অপূর্ব মন্তব্য করিয়াছেন,—

"চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হৈঞা ;
ব্রহ্মা শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া।
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে '
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে।
লক্ষ্মী-আদি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হৈয়া ;
নাম-প্রেম আস্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া।
অন্যের কা কথা ? আপনে ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
অবতরি করে প্রেম 'নাম' আস্বাদন।
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময় ?'
'সাধু কৃপা' না করিলে প্রেম নাহি হয়।'

চৈঃ চঃ, অন্ত্য ৩য়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফুলিয়ায় প্রেমোন্মাদ

ঠাকুর হরিদাস শান্তিপুর হইতে ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাসের সময় ফুলিয়া ও শান্তিপুর একজন কাজীর অধীনে ছিল। তাহার নাম ছিল গোড়াই কাজী। আর নবদ্বীপ ছিল আর একজন কাজীর অধীনে, তাহার নাম ছিল চান্দ কাজী। ফুলিয়ায় বহু সংখ্যক সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। তাঁহারা সকলেই ঠাকুর হরিদাসের অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি দর্শনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

"ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ-সকল।
সভেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল॥
সভার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস॥
ফুলিয়ায়ে রহিলেন প্রভু হরিদাস।"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

প্রাণের সুহৃদ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গেও এখানে তাঁহার প্রত্যেক দিন মিলন হইত।

"পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাঞি॥
হরিদাস ঠাকুরো অদ্বৈত দেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রসসমুদ্রতরঙ্গে॥" (মহাজন পদ)

এখন ঠাকুর হরিদাসের ভক্তিলতা ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছে এবং এবং তাহাতে প্রেমফলও সুপক্ক হইয়াছে। তিনি এখন প্রেম-অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান ঠাকুর হরিদাস যে পরম ফল ভোগ করিলেন তাহার নিকট চারি পুরুষার্থ ছার!

সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন ॥
এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥"

ঠাকুর হরিদাসের এখন দিব্য প্রেমোন্মাদ অবস্থা। শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার দিব্যোন্মাদ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি উচ্চস্বরে ॥
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য ॥
ক্ষণেকো গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা-মতি ॥
কখনো করেন নৃত্য আপনা আপনি।
কখনো করেন মত্ত-সিংহ-প্রায় ধ্বনি ॥
কখনো বা উচ্চস্বরে করেন রোদন।
অট্টঅট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন ॥
কখনো গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখনো মূর্ছিত হই থাকেন পড়িয়া ॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বোলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাহি বাখানেন উত্তম করিয়া ॥
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তিবিকারের যত আছে মর্ম্ম ॥
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে ॥
হেন সে আনন্দধারা—তিতে সর্ব্ব-অঙ্গ।
অতি-পাষণ্ডিও দেখি পায় মহা-রঙ্গ ॥

কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি।
ব্রহ্মা শিবো দেখিয়া হয়েন কুতূহলি॥

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১শ

ঠাকুর হরিদাস পূর্ব্বে নির্জ্জন কুটীরে বা গোফাতে বসিয়া 'নাম' করিতেন। এখন উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে নাম কীর্ত্তন 'যজ্ঞ' * নামে অভিহিত হইয়াছে।

যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ (শ্রীমদ্‌ভাগবত)

ঠাকুর হরিদাস এখন নিজে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শত শত লোককে উন্মত্ত করিতে লাগিলেন। ফুলিয়ায় আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল। কিন্তু এ জগতে যেখানে স্বর্গ সেখানে অসুরের অত্যাচার, যেখানে তপোবন সেখানে রাক্ষসের উপদ্রব, যেখানে যজ্ঞ সেখানেই ভূত পিশাচের বিভীষিকাময় রব ও তাণ্ডব। ঠাকুর হরিদাসের আরব্ধ জীবনেও অগ্নিপরীক্ষা অচিরাৎ উপস্থিত হইল।

---

* যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিতে "যজ্ঞ" বলিলেই উহা একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য এবং তাহা বিত্তবানদের জন্য সংরক্ষিত একটি কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যাপার বুঝাইতে। কিন্তু কলিযুগে সর্ব্বসাধারণের জন্য এবং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলে এই নাম যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারে, ইহাই ভাগবতীয় ধর্ম্মের উপদেশ। (মৎস্য পুরাণে—১১২ ও ১০৯, ৩৮, ২১ দ্রষ্টব্য)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অগ্নি-পরীক্ষা (কারাবরণ কারাবাস)

ঠাকুর হরিদাসের প্রতিপত্তির সংবাদ গোড়াই কাজীর কর্ণগোচর হইল। গোড়াই যখন দেখিলেন যে হরিদাস তাঁহার অধিকারের মধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন,তখন গোড়াইএকেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। গোড়াই ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে স্বয়ংই কতকটা শাসন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ঠাকুর হরিদাসের প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বের ভয়ে নিজে তাঁহার আচরণের কোনও প্রতিবাদ না করিয়া 'মুলুকপতির' নিকট উপস্থিত হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগী, মুসলমানদ্রোহী বলিয়া তাঁহার নামে রীতিমত অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

"কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে॥
'যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল-মতে তারে আনি করহ বিচার'॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

'গোড়াই' মহকুমার একজন শাসক ছিলেন। গোড়াইর অভিযোগ মুলুকপতি মনোযোগের সহিত শুনিলেন এবং তাহার পরামর্শ অনুসারে ঠাকুর হরিদাসকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাইক পাঠাইলেন। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস যদি ধরা দিতে ইচ্ছুক না হইতেন তবে তাঁহাকে ধরিয়া নেওয়া এমন সহজ ব্যাপার ছিল না। সমস্ত হিন্দু সমাজ তখন তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। কিন্তু তিনি যেমন একদিকে নিষ্কাম ও নির্বিকার অন্যদিকে তেমনই নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। তিনি মুলুকপতির আদেশ শুনিয়াই ধরা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং বন্ধুজনের আর্ত্তনাদের মধ্যেই প্রাণের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিলেন। বরাভয়প্রদ ভগবানের

চরণে যাঁহার চিত্ত নিযুক্ত তাঁহার প্রাণ একদিকে কুসুম হইতেও মৃদু অন্যদিকে বজ্র হইতেও কঠিন। তাঁহার চিত্তে সংসারের অত্যাচার অবিচার শাসন ও শাস্তি কিছু ভয় বা বিভীষিকা উৎপাদন করিতে পারে না। ঠাকুর হরিদাসের নিকট পাইক আসিল। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস নির্ভীক চিত্ত, অচল, অটল।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয়॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে চলিলা সেই ক্ষণে।
মুলুকপতির দ্বারে দিলা দরশনে॥"

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১শ

সেদিন মুলুকপতির সঙ্গে ঠাকুর হরিদাসের সাক্ষাৎ হইল না। এখন যেমন বিচারের পূর্ব্বে কারাগারের হাজতে রাখার ব্যবস্থা আছে, তখনও ঐ প্রকার ব্যবস্থা ছিল। ঠাকুর হরিদাস উপস্থিত হইবামাত্রই কারাগারে বন্দী হইলেন। কারাগারে তখন বহু সংখ্যক হিন্দু বন্দী ছিলেন। বড় বড় জমিদারেরাও তখন উপযুক্ত সময়ে খাজনা দিতে না পারিয়া বন্দী হইতেন। ঠাকুর হরিদাস কারাগারে আসিতেছেন শুনিয়া বন্দীদিগের মধ্যে এক কোলাহল উঠিল। একদিকে যেমন তাঁহারা পরম বৈষ্ণব ঠাকুর হরিদাসকে দেখিবার জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন, অন্যদিকে তেমনি ভক্তবীরের কারাবাসের সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার দর্শনাভিলাষী বন্দীগণ ব্যস্ত চিত্তে যথাসাধ্য উপযুক্ত স্থান অধিকার করিল। কেহ কেহ রক্ষকদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বিশিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন দেবদুর্লভ মনোহর জ্যোতির্ময় প্রেমিক ভক্ত কারাগারের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার পথের দুই পার্শ্বস্থ বন্দীগণ তাঁহাকে ভক্তিগদগদ চিত্তে প্রণাম করিল॥ ঠাকুর

হরিদাস সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাহাদের প্রাণে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হইল।

"হরিদাস ঠাকুরের শুনিঞা গমন।
হরিষ-বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥
বড় বড় লোক যত আছে বন্দী-ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে॥
'পরম-বৈষ্ণব হরিদাস-মহাশয়।
তানে দেখি বন্দী-দুঃখ হইবেক ক্ষয়॥'
রক্ষক-লোকেরে সভে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দীগণ একদৃষ্টি হৈয়া॥
হরিদাস ঠাকুর আইলা সেইস্থানে।
বন্দী সব দেখি কৃপাদৃষ্টি হৈল মনে॥
হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিয়া।
রহিলেন বন্দীগণ প্রণতি করিয়া॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল নয়ান।
সর্ব্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপাম॥
ভক্তি করি সভে করিলেন নমস্কার।
সভার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার॥

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১শ

কারাগার আজ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। যাহারা আজীবন বিষয় কূপে ডুবিয়া থাকিত তাহাদের প্রাণে ভক্তকৃপায় অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। বন্দীদের ভক্তি দেখিয়া ঠাকুর হরিদাস তাহাদিগকে সহাস্য বদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

'থাক থাক এখন আছহ যেন-রূপে।'
গুপ্ত-আশীর্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১শ

ঠাকুর হরিদাস দেখিলেন যে তাহারা তাঁহার আশীর্বাদের মর্ম্ম না বুঝিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইয়াছেন। তিনি তখন তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহার আশীর্বাদের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"আমি তোমা সভারে যে কৈল আশীর্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ॥

* * *

এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা সভাকার মন।
যেন আছে, এইমত রহু সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নৃত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সভে মেলি করিতে আছহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন।
'কৃষ্ণ' বলি কাকুবাদে করহ চিন্তন॥
আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে।
সভে ইহা পাসরিবে, গেলে দুষ্ট-মেলে॥
এই সব অপরাধ হৈব পুনর্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার॥
'বন্দী থাক' হেন আশীর্বাদ নাহি করি।
'বিষয় পাসর অহর্নিশ বোল হরি॥"
ছলে করিলাঙ আমি এই আশীর্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ॥
সর্বজীব প্রতি দয়া দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউ তোমরা-সভার॥
চিন্তা নাই—দিন-দুই-তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিব, এই কহিলুঁ তোমারে॥
বিষয়েতে থাক, কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভো না পাসরিহ সর্বথা॥"

"বিষয়-আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল
স্ত্রী পুত্র মায়াজাল এই সব কাল ॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়-আবেশ ছাড়ি কৃষ্ণেরে ভজয় ॥" (মহাজনপদ)

ঠাকুর হরিদাসের উপদেশ ও আশীর্বাদপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বন্দীগণ পুনরায় আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইল, এবং ঠাকুর হরিদাসকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। দেবদূতগণ যাঁহাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে বাঞ্ছা করেন তিনি আজ সামান্য প্রহরীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া দিন ও রাত্রি কারাগারে যাপন করিলেন।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচারালয়

পরদিন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুলুকপতির দরবারে বিচারার্থ নীত হইলেন। আজ দরবার লোকে লোকারণ্য। মুলুকপতি পাত্র, মিত্র, নাজীর, উজীরে পরিবেষ্টিত হইয়া দরবারে বসিয়া আছেন। ধর্ম্ম সংক্রান্ত-প্রশ্নের বিচার হইবে একারণ আটজন কাজীও দরবারে উপস্থিত আছেন। ফুলিয়ার গোড়াই কাজী অভিযোক্তারূপে সেখানে উপস্থিত, এমন সময় প্রহরীগণ ঠাকুর হরিদাসকে নিয়া দরবারে উপস্থিত হইল। মুলুকপতি দেখেন যে তাঁহার সম্মুখে এক দিব্যজ্যোতি মহাপুরুষ উপস্থিত। তাঁহার দিব্য কান্তি ও অসামান্য তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া তিনি অতিশয় মুগ্ধ হইলেন এবং যদিও হরিদাস তাঁহার সমক্ষে অপরাধীরূপে দণ্ডায়মান, তথাপি তাঁহাকে বহু সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বসিবার আসন প্রদান করিলেন।

"অতি-মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম-গৌরবে বসিবারে দিলা স্থান॥"

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১শ

মুলুকপতি শ্রীলহরিদাসকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া তাঁহাকে মৃদুস্বরে সাদর সম্ভাষণে বলিলেন—

"কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি—
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হইয়াছ যবন;
তবে কেন তুমি হিন্দুর আচারে দেহ মন?
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত;
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত!
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য-ব্যবহার;
পর-লোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার?

না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাও করি কলমা-উচ্চার।"

চৈঃ, ভাঃ আদিঃ ১১শ

ঠাকুর হরিদাস যেরূপ শ্রীহরিকরুণার দুর্ভেদ্য বর্ম্মে রক্ষিত হইয়া আছেন, তাহাতে কোন বাক্যবাণ তাঁহার হৃদয় ভেদ করিতে পারে না। কলমা পড়িয়া তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এইরূপ প্রস্তাব শুনিয়াও শ্রীলহরিদাস কোন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন না। পরন্তু

"শুনি মায়ামোহিতের বাক্য হরিদাস!
'অহো বিষ্ণুমায়া!' বলি হৈল মহাহাস॥"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরহরিদাস মুলুকপতিকে মধুরকণ্ঠে ও প্রিয়সম্ভাষণ পূর্বক তাঁহার উদার হৃদয়ের উদার ধর্ম্ম সর্ব-সমক্ষে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "হে রাজন! এক শুদ্ধ শাশ্বত অখণ্ড অব্যয় ব্রহ্ম সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। যিনি হিন্দুর 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ', যিনি জ্ঞানীর 'ব্রহ্ম', ভক্তের 'ভগবান' যোগীর 'অন্তরাত্মা' তিনিই মুসলমানদের 'আল্লা'। একই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকেন। হিন্দুর বেদ ও পুরাণে যে 'তত্ত্ব কথা' মুসলমানের কোরাণেও সেই 'তত্ত্ব কথা'। একই প্রভুর গুণাবলী রুচিভেদে নানা শাস্ত্র নানা ভাবে প্রচার করিতেছে। আমি হরিনাম লইতে ভালবাসি। আর একজন অন্য নাম লইতে ভালবাসেন। রুচিভেদ হইলেও বস্তুতঃ প্রভু তো এক। সুতরাং তিনি—

এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইয়াছেন চিত্তে, করি আমি তেন॥
হিন্দু কুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥

মহাশয়! তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

শ্রীল হরিদাস এইরূপ সম্প্রদায় ধর্ম্মের মিলন ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মসমন্বয়ের দিকসূত্র উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার উদার মত সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষণীয় বস্তু। ঠাকুর হরিদাস যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন সম্প্রদায় ধর্ম্মের প্রচারকরা সেই মূলে দণ্ডায়মান হইলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি কাটাকাটি পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে পারে। 'যাঁহাকে' নিয়া বিবাদ তাঁহার অভেদত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর হরিদাস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে যে 'মহাসত্য' সভাস্থলে বিবৃত করিলেন, তাহা শুনিয়া সমবেত মুসলমানমণ্ডলী মুগ্ধ স্তম্ভিত হইলেন। মুলুকপতির হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। কিন্তু গোড়াই কাজীর পাষাণ হৃদয় টলিল না। সে দেখিল যে তাহার শিকার ফস্‌কাইয়া যাইতেছে। অমনি ব্যস্তভাবে দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে মুলুকের পতির নিকট সবিনয়ে বলিতে লাগিল, "প্রভু বিচারপতি! এই ব্যক্তির প্রতি আপনি সমুচিত শাস্তি বিধান করুন। ইহার কুদৃষ্টান্তে আরও মুসলমান সন্তান হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান কুলে কলঙ্ক আরোপ করিবে। হয় এ ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিবে নচেৎ ইহার প্রতি গুরুতর শাস্তি বিধান করুন। যদি আপনি এ বিষয়ে উদাসীনতা প্রকাশ করেন তবে বঙ্গদেশে মুসলমান গৌরব অচিরাৎ বিলুপ্ত হইবে।" গোড়াই কাজীর এই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া মুলুকপতির মত ফিরিয়া গেল। তিনি পুনরায় ঠাকুর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"আরে ভাই!
আপনার শাস্ত্র বোল, তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজী গণে
বলিয়াও পাছে, আর লঘু হৈবা কেনে?"

মুলুকপতি হরিদাসকে যথাসাধ্য ভয় প্রদর্শন করিলেন, তাঁহার চরম সিদ্ধান্তও জানাইলেন। কিন্তু 'ভক্তবীর' অচল অটল ভাবে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর যাহা করান তাহা বই আর কেহ কিছু করিতে পারে না। যাহার যেরূপ অপরাধ ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন।"

হরিদাস বোলেন—"তে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥
অপরাধ—অনুরূপ যার যেন ফল।
ঈশ্বর সে করে, ইহা জানিহ সকল॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

ঠাকুর হরিদাস তারপর মনে মনে চিন্তা করিলেন যে এমন কি শাস্তি আছে যাহার ভয়ে আমি 'হরিনাম' ছাড়িতে পারি? মনে এই প্রশ্ন হওয়া মাত্র ধীর, শান্ত, সৌম্য, কোমলপ্রাণ হরিদাস/প্রহ্লাদের ন্যায় সিংহ গর্জনে গর্জন করিয়া বলিলেন—

"খণ্ডখণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম:"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

ঠাকুর হরিদাস দিব্য চক্ষে তাঁহার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে একদিকে 'হরি-নামামৃত' অন্যদিকে ভীষণ অত্যাচার, কঠোর শাস্তি, প্রাণান্তিক যাতনা, মৃত্যুর বীভৎস মূর্তি।

হরিনামামৃত পানে উন্মত্ত হরিদাস অনায়াসে সকল ভয় উপেক্ষা করিয়া যে মহাবাণী উচ্চারণ করিলেন তাহা "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" ভক্তের প্রাণে ধ্বনিত প্রতিধ্বানত হইবে। ভারতবর্ষের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া মধুর এবং দৃপ্ত কণ্ঠে এমন বাণী প্রহ্লাদের পরবর্ত্তী সময় আর কখনো কোথাও উত্থিত হয় নাই। এ অশরীরী বাণী চির সম্পত্তি রূপে বিশ্বের প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে, ধর্ম্ম মন্দিরে সাধনার সর্ব্বোত্তম আদর্শরূপে বিরাজ করিবে। 'নাম-জপ' যাঁহাদের সাধনার অঙ্গ তাঁহারা যদি নামের ন্যায়

'এ বাণী' জপ করেন তবে তাঁহাদের দুর্বল প্রাণে বল আসিবে, মৃত দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইবে, সকল ভয় দূরে পলায়ন করিবে। ঠাকুর হরিদাসের এই অশ্রুতপূর্ব অমৃতময়ী প্রতিজ্ঞা পাঠকগণ আর একবার স্মরণ করুণ ॥

"খণ্ডখণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম ॥"

মুলুকপতির দরবার আজিকালিকার বিচারালয় নহে, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে নিজের মত ব্যক্ত করিতে পারে অথচ সেই জন্য তাহার প্রতি আইন সঙ্গত দণ্ডের মাত্রা বৃদ্ধি পায় না। বর্ত্তমান সময়ের দণ্ডবিধি তদানীন্তন দণ্ডবিধির তুলনায় ভিন্ন ধরণের—কিন্তু তদানীন্তন সময়ে মুসলমান দণ্ডবিধির মধ্যে শারীরীক দণ্ড যেরূপ ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করিত, অধুনাতন কারাবাস, নির্ব্বাসন ও প্রাণদণ্ড তাহার বিন্দুমাত্রও ভীতি বা আতঙ্কের সঞ্চার করিতে পারে না।

ক্রুদ্ধ রক্তিমলোচন কাজীগণ ও মুলুকপতির সমক্ষে ও সশস্ত্র প্রহরীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া হরিদাস যেরূপ বীরত্ব, তেজস্বিতা ও ভগবদ্‌নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন, বর্ত্তমান জগতে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মুসলমান মুলুকঅধিপতি ঠাকুর হরিদাসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। এখন আর তাঁহাকে বশীভূত করিবার আশা রহিল না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোড়াই কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ইহার প্রতি কি ব্যবস্থা করিবা ?"

গোড়াই কাজী উত্তর করিল—"এখন আর বিচার দরকার নাই। ইহাকে বাইশ বাজারে নিয়া কঠোর বেত্রাঘাত করিয়া ইহার প্রাণ হরণ করিতে হইবে। বাইশ বাজারে মারিলেও যদি এ ব্যক্তি জীবিত রহে তবে বুঝিব যে ইহার কথা সত্য।

"কাজী বোলে 'বাইশ বাজারে নিঞা মারি।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি ॥

বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি, জ্ঞানী—সব সাঁচা কথা কহে॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১১

গোড়াই কাজী মুলুকপতির মতের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই পাইক সকল ডাকিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিতে লাগিল।

"এমত মারিবি, যেন প্রাণ নাহি রহে।"
যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১

পাপাত্মা মুলুকপতি নরাধম গোড়াই কাজীর অভিমত অনুমোদন করিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হইতে দুরন্ত পাঠান পাইকেরা আসিয়া ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, অহিংসার মূর্ত্ত-বিগ্রহ ঠাকুর হরিদাসের দিব্য তনুকে বন্ধন করিল। শ্রীভগবন্নামের ও নাম গ্রহণকারীর অসমোর্দ্ধ মহিমা খ্যাতি হইবে বলিয়া স্বর্গে বোধহয় সেদিন দুন্দুভি বাজিল। বিশ্বে মহাশঙ্খ ধ্বনিত হইল। ভক্তগণ বিশ্বরাজের সিংহাসন ঘেরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'প্রেম ভক্তির' বিজয় নিশান বঙ্গের পূণ্যময় আকাশে উড্ডীন হইল!

নবম পরিচ্ছেদ

দণ্ডবিধান

দুরন্ত পাঠান পাইকগণ ঠাকুর হরিদাসকে বন্দী করিয়া বাজারে বাজারে নিয়া বেত্রাঘাতে তাঁহার সুকোমল তনু জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। কাতারে কাতারে অসংখ্য লোক শোকে দুঃখে উৎকণ্ঠায় চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাজার পূর্ণ করিল। পাইকেরা সেই জনপ্রবাহের মধ্য দিয়া ঠাকুর হরিদাসকে প্রাণান্ত করিয়া বেত্রাঘাত করিতে করিতে চলিতে লাগিল। ঠাকুর হরিদাসের রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া দর্শকগণ শোকে দুঃখে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইল। চতুর্দ্দিকে শত সহস্র কণ্ঠে কেবল হাহাকার ধ্বনি! শত সহস্র চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা!

দেখি হরিদাসদেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেহো বোলে উর্ভিষ্ট হইবে সর্ব্ব-রাজ্য।
সে নিমিত্তে হেন সুজনের হেন কার্য্য॥
রাজা উজিরেরে কেহো শাপে' ক্রোধ-মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোনো জনে।
কেহ গিয়া যবনগণের পা'য়ে ধরে।
কিছু দিব, অল্প করি মারহ উহারে॥"

চৈ, ভা, আদি ১১

কিন্তু পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি পাঠান পাইকদের হৃদয় তাহাতেও বিন্দুমাত্র টলিল না।

"তথাপি দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে।
বাজারে বাজারে মারে মহাক্রোধ-মনে॥

চৈ, ভা, আদি ১১

যোগীবর ঈশার দুঃখে উনবিংশ শতাব্দী যাবৎ লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান অশ্রু নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু ঈশা যখন ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন তখন তাহার মর্ম্মান্তিক যাতনা অল্পসংখ্যক লোকই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিল। যবনরাজ ও তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গগণ বাজারে বাজারে সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে ঠাকুর হরিদাসকে নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া শোকের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিল। ক্রুশবিদ্ধ যোগনিষ্ঠ ঈশা অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "Father, hast thou forsaken me? Hast thou forsaken me?" "হে পিতঃ, তুমি কি সত্য সত্যই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" ঈশার অটল বিশ্বাস ক্ষণিকের জন্য টলমল করিয়াছিল। কিন্তু নির্ম্মম পাঠান পাইকগণের মর্ম্মান্তিক প্রহারের মধ্যে রক্তাক্ত কলেবর ঠাকুর হরিদাসের কি প্রকার মানসিক অবস্থা তাহা জানিতে সকলেই উৎসুক। ঠাকুর হরিদাস কোন আর্ত্তনাদ করিলেন না। ভাবে ভঙ্গীতেও কোন যাতনার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। তিনি কৃষ্ণনামামৃতসিন্ধু মাঝে নিমগ্ন। দেহস্মৃতি নাই—দেহ- দুঃখের অনুভবও নাই।

কৃষ্ণকৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহদুঃখ না হয় প্রকাশ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে॥
অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদবিগ্রহে।
কোনো দুঃখ না জন্মিল সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে॥
এইমত যবনের অশেষ-প্রহারে।
দুঃখ না জন্ময়ে হরিদাস ঠাকুরের॥

চৈ, ভা, আদি ১১শ

হে ভারতভূমি! ধন্য তুমি! ঠাকুর হরিদাসের ভিতর তুমি যে আদর্শ দেখাইয়াছ তাহা জগতের লোক কল্পনাবলেও ধারণা করিতে পারে না।

পাইকগণ ঠাকুর হরিদাসকে একে একে বাইশ বাজারে নিয়া প্রাণপণে প্রহার করিল কিন্তু ঠাকুর হরিদাসের প্রাণ-বায়ুর অবসান হইল না। পাইকরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল

মানুষের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে।
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ-বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে॥
মরেও না ; আরো দেখি হাসে ক্ষণেক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা ? সভেই ভাবে মনে।"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

এ নিদারুণ প্রহারের সময়ে কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট ঠাকুর হরিদাসের চিত্তে আত্মসম্পর্কে দুঃখ জন্মিল না বটে। কিন্তু তাঁহার পরদুঃখকাতর দয়ার্দ্র চিত্ত অত্যাচারী পাপীদের দুঃখে ব্যথিত হইল। এ সব পাপীদের কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা ভাবিয়া তিনি আকুল। অত্যাচারীদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া—ঠাকুর হরিদাস ভগবানের নিকট উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সভার অপরাধ॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

এরূপ প্রার্থনা বিশ্বে আর কোনও দিন উচ্চারিত হইয়াছিল কিনা জানিনা। সর্ব্বজীবে প্রেম, শত্রু ও ঘাতকের প্রতি অপার করুণা, বৈষ্ণব চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ! এই গুণের পূর্ণাবতার ঠাকুর হরিদাসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

পাইকেরা ঠাকুর হরিদাসের 'প্রার্থনা' শুনিয়া চমকিত ও বিস্মিত হইল। তাহারা ঠাকুর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

অয়ে হরিদাস!
তোমা হৈতে আমা সভার হইবেক নাশ॥

এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা সভাকার ॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

তখন ঠাকুর হরিদাস হাসিয়া উত্তর করিলেন,

'আমি জীলে যদি তোমা সভার মন্দ হয়।
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান ॥'
সর্ব্ব-শক্তি সমন্বিত প্রভু হরিদাস।
হইলেন অচেষ্ট, কোথাও নাহি শ্বাস ॥

তাহা দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইল। তাহারা ঠাকুর হরিদাসকে মুলুকপতির দ্বারে লইয়া ফেলাইল ॥" চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

মুলুকপতি ঠাকুর হরিদাসকে মৃত জানিয়া তাঁহাকে মাটি দেওয়ার আদেশ করলেন। কিন্তু গোড়াই কাজী মৃতের প্রতিও বিদ্বেষ ভুলিতে পারিল না। যবন নীতির অনুসরনে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—

"মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল, যেন দুঃখ পায় চিরকাল ॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

কাজীর আদেশ অনুসারে পাইকগণ ঠাকুর হরিদাসকে গাঙ্গে ভাসাইয়া দিবার জন্য তুলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু শ্রীহরিদাস যোগাসনে নিশ্চল হইয়া রহিলেন। মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। মহাবলবন্ত পাইকগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে তুলিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও নড়াইতে পারিল না।

"ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর-হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি করিলা প্রকাশ ॥
বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে ॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

পরিশেষে যবনরাজের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ঠাকুর হরিদাস নিজের

শরীরকে হালকা করিয়া লইলেন। পাইকেরা (ঠাকুর হরিদাসের কৃপায়) তাঁহার বাহ্য প্রকাশ শূন্য দেহ তুলিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার অতঃপর বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণানন্দ সুধা সিন্ধু মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হই আছেন, বাহ্য নাহি পরকাশ॥
কিবা অন্তরীক্ষে, কিবা পৃথ্বীতে, গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস, আছেন কোথায়॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

ঠাকুর হরিদাস গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে সহসা তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন তিনি পরমানন্দময় চিত্তে তীরে আসিয়া উঠিলেন।

"হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায়।
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥
চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়।
তীরে আসি উঠিলেন পরমানন্দময়॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

ঠাকুর হরিদাস তীরে উঠিয়া উচ্চ রবে 'কৃষ্ণ' নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় ফুলিয়া অভিমুখে চলিলেন। অচিরাৎ তাঁহার পুনর্জ্জীবন সংবাদ—চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য উত্তম অধম সমস্ত লোকই ক্ষিপ্ত প্রায় ছুটিয়া আসিল। মুসলমানেরা তাঁহার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া পীরজ্ঞানে তাঁহাকে নমস্কার করিল। স্বয়ং মুলুকপতিও তাঁহার দর্শনে আসিলেন। ঠাকুর হরিদাস হাসিয়া মুলুকপতির প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত করিলেন। মুলুকপতির হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি করজোড়ে ঠাকুর হরিদাসকে সসম্ভ্রমে ও সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন—

"সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা-পীর।
একজ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥

যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বোলে।
তুমি সে পাইল সিদ্ধি মহা-কুতূহলে॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

তিনি পুনরপি বলিতে লাগিলেন হে সিদ্ধপুরুষ! আমি তোমার দর্শনাকাঙ্খী হইয়া এতদূর আসিয়াছি। তোমার বিশ্বজনীন প্রেমের নিকট শত্রু, মিত্র ভেদ নাই। আমি পরম অপরাধী, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। এজগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে তোমাকে চিনিতে পারে? তারপর তিনি সানন্দে আদেশ ঘোষণা করিলেন—

চল তুমি, শুভ কর, আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন-গোফায়॥
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমাব ইচ্ছা, তাহি কর সর্ব্বথা॥"

চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

ঠাকুর হরিদাস সমবেত মুসলমানগণ এবং মুলুকের পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন এবং গঙ্গাতট পথে 'হরিনাম' গাইতে গাইতে ফুলিয়ায় আসিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগী ভক্ত ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন!

বৈতরণীর ওপার হইতে যেন মৃত্যুঞ্জয় বীর বিজয় মুকুট ধারণ করিয়া বন্ধুজনগণ মধ্যে অকস্মাৎ প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর হরিদাস যে বিজয় গৌরবের অধিকারী তাহার তুলনায় বিশ্ব-বিজয়ী বীরের বিজয় গৌরব কি ছার। যোদ্ধৃগণ পশুবলে শত্রু জয় করিয়া শত্রুর হৃদয়ে হিংসানল শতগুণে প্রজ্বলিত করেন। আর ঠাকুর হরিদাস প্রেমবলে শত্রুদের হৃদয় জয় করিয়া সেখান চির শান্তি স্থাপন করিয়া তাহাদের জীবন ধন্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্বরূপ মহাপুরুষেরা এই প্রেমের বলেই বিশ্ব জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রেমই তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল। অন্য কোনও অস্ত্রের শক্তিতে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না।

———

দশম পরিচ্ছেদ

অভ্যর্থনা

যমালয় হইতে প্রত্যাগত হওয়ার মত ঠাকুর হরিদাস যখন ফুলিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অবিশ্রাম হরিধ্বনি গগন মণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

"ফুলিয়ায় আইলেন ঠাকুর হরিদাস ॥
উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ সভাতে ॥
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সভেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥" চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

সে হরিধ্বনি শুনিয়া হরিদাস আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্রু, কম্প, হাস্য, মুর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার প্রভৃতি ভক্তির অদ্ভুত লক্ষণ সকল তাঁহার শ্রীবিগ্রহে ফুটিয়া উঠিল। ঠাকুর হরিদাস প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। দর্শক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল।

"অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মুর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার ॥
আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে ॥" চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

যখন নৃত্য কীর্ত্তন থামিল, ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, আপনারা আমার জন্য দুঃখিত হইবেন না। এই কর্ণে প্রভুর অজস্র পাপ নিন্দার কথা শুনিয়াছিলাম, এই কর্কশ শাস্তিই

আমার যথোপযুক্ত দণ্ড লাভ হইয়াছে। ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কারণ গুরুতর অপরাধের জন্য ইহা লঘু শাস্তির ঘটনা ঘটিয়াছে। 'বিষ্ণু' নিন্দা শ্রবণ করিলে কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইতে হয়। সেই বিষ্ণু নিন্দা আমি এই কর্ণে বিস্তর শুনিলাম। তাহারই জন্য উপযুক্ত শাস্তি পাইলাম। আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই পাপে আর পুনর্ব্বার পতিত না হই।"

"কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণু-নিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলাম পাপ কানে॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বরে তাহার॥
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার।" চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

কি অদ্ভুত নির্ব্বিকার চিত্ত! কি আশ্চর্য্য দৈন্য! কি নিগূঢ় আত্মদৃষ্টি! কি সূক্ষ্ম পাপ বোধ! ইহার তুলনা জগতে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? ঠাকুর হরিদাসের হৃদয়খানি সত্য সত্যই সৌন্দর্য্যের খনি, প্রেমের প্রস্রবণ, ভাবের নন্দন কানন।

ঠাকুর হরিদাস এখন প্রত্যেকদিন ফুলিয়ায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আনন্দ সংকীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। তিনি গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে এক গোফায় কৃষ্ণনামানন্দে অহর্নিশ ডুবিয়া থাকিতেন।

ঠাকুর বৃন্দাবন দাস অপূর্ব মন্তব্য করিয়াছেন—

তিন-লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফাই হইল তান বৈকুণ্ঠ ভবন॥ চৈঃ ভাঃ আদি ১১ শ

এই গোফায় বহুদিন হইতে এক বিষধর সর্প বাস করিত। ঠাকুর হরিদাসের দর্শনে যাঁহারা আসিতেন সকলেই সেই বিষধর সর্পের জ্বালায় অস্থির হইতেন।

"মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
যার জ্বালা প্রাণি মাত্র সহিতে না পারে॥

হরিদাস ঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে।
যতেক আইসে, কেহো না পারে রহিতে॥"

চৈঃ ভাঃ আদি১১শ

ঠাকুর হরিদাস কিন্তু বিষের জ্বালা বুঝিতে পারেন না, অন্য সকলেই তীব্র বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রধান বেদিয়াদের আনাইলেন। বৈদ্যগণ বলিলেন

"এই গোফার তলায়।
মহা এক নাগ আছে, তাহার জ্বালায়॥
রহিতে না পারে কেহো, কহিল নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুক অন্যাশ্রয়॥" চৈ ভাঃ আঃ ১১শ

ঠাকুর হরিদাসের এই গোফা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া ভাল এই বিবেচনায় সকলে ঠাকুর হরিদাসের নিকট নিবেদন করিল,—"প্রভো!

'মহা-নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহো রহিতে না পারে॥
অতএব এখানে রহিতে যোগ্য নহে।
অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়ে॥" চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

উত্তরে ঠাকুর হরিদাস বলিলেন "আমি ত বহুদিন এখানে আছি, কৈ কোন বিষের জ্বালা বা রিষ্ট তো আমি দেখি না। যাই হোক তোমাদের কষ্ট দেখিয়া আমার স্থানান্তরে যাওয়া উচিত।

সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তিঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়॥
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্ব্বথা।
চিন্তা নাই তোমরা বোলহ কৃষ্ণগাথা॥" চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা—

"গর্ত্ত হইতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।

সভেই দেখেন চলিলেন অন্য-দেশে ॥
পরম অদ্ভুত সর্প—মহা-ভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুক্ল-বর্ণ—পরম-সুন্দর ॥
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে।
দেখি ভয়ে বিপ্রগণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরে ॥
সর্প যে চলিয়া গেল, জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার।
দেখি হরিদাসঠাকুরের মহা-শক্তি ॥
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি ॥" চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

হরিদাস ঠাকুরের এ কোন্ প্রভাব।
যাঁর বাক্য-মাত্র স্থান ছাড়িলেন নাগ ॥
যাঁর দৃষ্টিমাত্র ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন ॥" চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

প্রসঙ্গত ঠাকুর হরিদাসের আর একটি অদ্ভুত আখ্যান শ্রবণ করুন। এই মহিমার বক্তা কোনও মানুষ নহে—একটি নাগরাজ। একদিন এক ধনীর গৃহে সর্পক্ষত ডঙ্ক* বিভিন্ন প্রকারে নাচিতেছিল। দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন ঠাকুর হরিদাস। তিনি একপাশে দাঁড়াইয়া ডঙ্ক-নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। শ্রীশ্যামসুন্দরের ঐশ্বর্য-মাধুর্যমণ্ডিত কালীয়দমন লীলা কীর্ত্তনের তালে তালে মানুষের শরীরে নাগরাজ মন্ত্রবলে অধিষ্ঠিত হইয়া সকৌতুকে নাচিতেছিলেন। নিজ প্রভুর মহিমা শ্রবণে ঠাকুর হরিদাস প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া

*পুরাকালে যাঁহারা মন্ত্রৌষধি দ্বারা সর্পবিষ চিকিৎসার ব্যবসা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা মন্ত্রদ্বারা একধরণের সর্পসিদ্ধি লাভ করিতেন। সেই সিদ্ধির দ্বারা তাঁহারা কোনও বিষধর সর্পের দংশনের দ্বারা মহাসর্পের ভাবে ভাবিত হইয়া ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বহু ব্যাপার অবগত হইতে পারিতেন। কথ্যভাষায় এই ডঙ্ককে বলিত 'ডাক'।

পড়িলেন ; ক্ষণকাল পরে চেতনা পাইয়া তিনিও আনন্দভরে নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমাবেশ হইল। শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের ভাষায়,

গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক-অশ্রু-কম্পের প্রকাশ॥
রোদন করেন হরিদাস মহাশয়।
শুনিঞা প্রভুর গুণ হইল তন্ময়॥

ডঙ্ক জোড়হস্তে দেখিতে লাগিল। আর উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সানন্দে ঠাকুর হরিদাসের চরণরেণু অঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। সেইখানে এক দুষ্ট প্রকৃতির 'ঢঙ্গ বিপ্র' ছিল। সে ভাবিল একটু নাচিলেই বুঝি মানুষ তাহাকে ভক্তি করে। অতএব

'সেইখানে আছাড় খাইয়া।
পড়িল যেহেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥

কিন্তু এবার আর ডঙ্ক জোড়হস্তে রহিল না বরং সক্রোধে তাহাকে মারিতে লাগিল।

বেত্রের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জর হইয়া।
'বাপ বাপ' বলি ত্রাসে গেল পলাইয়া॥ (চৈঃ ভাঃ)

অতঃপর ডঙ্ক পুনরায় নিজসুখে বিস্তর নাচিল। দর্শকগণ সবিস্ময়ে সবিনয়ে ডঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'কহ দেখি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে।
হরিদাস নাচিতে বা জোড়হস্ত কেনে॥' (চৈঃ ভাঃ)

তখন সেই ডঙ্কমুখে 'বিষ্ণুভক্ত নাগ' ঠাকুর হরিদাসের প্রভাব বর্ণনা করিয়া বলিলেন, তোমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বড়ই রহস্যময়, অকথ্য ; তথাপি বলিতেছি। ঐ বিপ্র ঠাকুর হরিদাসের আবেশ দর্শনে মাৎসর্যান্বিত হইয়া আছাড় খাইয়াছে।

হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি করে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে॥

তাহার মাৎসর্য্যের, দম্ভের উচিত শাস্তি দিয়াছি। পক্ষান্তরে ঠাকুরের নৃত্য কেমন জান? 'ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব-বন্ধ হয় নাশ।

হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়ে ও নৃত্য দেখনে॥' (চৈভাঃ)

তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ নিরন্তর বদ্ধ, অতএব তিনি যথার্থই 'হরিদাস'। তিলার্দ্ধ তাঁহার সঙ্গ পাইলে জীবের কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় অবশ্যম্ভাবী। যদি বল তাঁহার যে যবনকুলে জন্ম? তবে বলি শোন,—

জাতিকুল সর্ব্ব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥

যেইভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণের ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার। দৃষ্টান্ত—'প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য। কপি হনুমান।' সেইমত হরিদাস ঠাকুরকে জেনো।

হরিদাস-স্পর্শে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥

স্পর্শ কা কথা তাঁকে দর্শনমাত্রে 'ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি-কর্ম্মপাশ'। এহো বাহ্য। হরিদাস আশ্রয় করিব যেই জন। তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসারবন্ধন॥ বলিহারি ঠাকুরের মহিমা। শত বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা। কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥ তোমরা শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছ, সুতরাং মহা ভাগ্যবন্ত। তোমাদের সংসর্গে আসাতেই তাঁহার মহিমা কিঞ্চিৎ বলি,—

সকৃত্ যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য সত্য সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম॥

এই বলিয়া শ্রীনাগরাজ মৌন হইলেন। সজ্জন সমাজ তো মহাতুষ্ট। নাগ মুখে ঠাকুরের মহামহিমা শ্রবণে তাঁহার প্রতি সকলেই বিশেষ প্রীতি করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপে ও গৌর আবির্ভাবে

কিছুদিন পরে ঠাকুর হরিদাস বৈষ্ণব দর্শনাভিলাষী হইয়া নবদ্বীপে চলিয়া আসিলেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য অনেকদিন পরে হরিদাসকে পাইয়া তাঁহাকে প্রাণের অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যাহাকে পূর্ব্বে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় দেখিয়াছিলেন, এখন তিনি মেঘমুক্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্। ঠাকুর হরিদাসের কীর্ত্তি এখন দেশ বিশ্রুত, তাঁহার মহিমা এখন সর্ব্বলোক বরেণ্য। কিন্তু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দৈন্য ও বিনয় পূর্ব্ববৎ অটুট। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তিনিও তাহাদিগকে ততোহধিক শ্রদ্ধা করিতেন।

সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস প্রতি।
হরিদাসো করেন সভারে ভক্তি অতি॥

চৈ, ভাঃ আদি ১১শ

ঠাকুর হরিদাসের জীবন প্রবাহ এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত। তিনি যন্ত্র শ্রীগৌরাঙ্গ যন্ত্রী। যে প্রেমের রাজ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহারাজ, সেখানে ঠাকুর হরিদাস প্রধান সেনাপতি। একজন দাস একজন প্রভু, একজন ভক্ত আর জন ভগবান্। ঠাকুর হরিদাস যাঁহাকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য প্রাণের সুহৃদ্ শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া উভয়ে একত্রে সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই প্রেমের দেবতা অনেকদিন হইল নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এখনও সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশিত হন নাই। ভগবানকে অবতীর্ণ করাইতে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য যখন গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিয়াছিলেন তখন ঠাকুর হরিদাস একই উদ্দেশ্যে 'নাম কীর্ত্তন' করিয়াছিলেন। আবার যখন চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুন মাসের

পূর্ণিমা তিথিতে সিংহ রাশিতে সিংহ লগ্নে জগন্নাথমিশ্রনন্দন শচী দেবীর গর্ভে নবদ্বীপ ভূমিতে উদয় হন—সেদিন ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শান্তিপুরে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। যে সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন সে সময় চন্দ্রগ্রহণ ছিল। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে অবিরাম হরিধ্বনি হইতেছিল। নারীগণ 'হরি হরি' বলিয়া উলুধ্বনি করিতে লাগিল। শ্রীল অদ্বৈতআচার্য্য হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, ঠাকুর হরিদাস সঙ্কীর্ত্তন যোগে সুমধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দুইজন মাত্র বুঝিলেন ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"অকস্মাৎ উঠে নাড়া করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস সচকিত দেখি ভঙ্গী তার॥
আনিলুঁ আনিলুঁ গোরা আনিলুঁ নদীয়া।
ইহা বলি নৃত্য করে আনন্দে মাতিয়া॥"

"জানিলেন হরিদাস গৌর জন্ম"

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাস ব্যতীত তাঁহাদের আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জানিলেন শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন—তিনি হইলেন ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীবাস পণ্ডিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গৌরের প্রকাশ লীলা

জগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলেও শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘর তাঁহার লীলা-বিলাসের পীঠস্থল হইয়াছিল। শ্রীবাসের অঙ্গনই ভক্তগণের মিলন-মন্দির হইয়াছিল। এখানে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্যগীতে নিশা অতিবাহিত করিতেন। ঠাকুর হরিদাসের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম পরিচয়ও খুব সম্ভবতঃ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীল অদ্বৈতাদি অনেক ভক্তের প্রথম মিলন শ্রীল বৃন্দাবন দাস মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু নিত্যানন্দ যখন মহাপ্রভুর প্রকাশ জানিতে পারিয়া নবদ্বীপে আসিয়া নন্দন আচার্য্যের ঘরে বাস করিতেছিলেন তখন মহাপ্রভু একদিন হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে পূর্ব্বে একদিন আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি এক মহাপুরুষের সঙ্গে অচিরাৎ সাক্ষাৎ হইবে। আমার মনে ধারণা হইতেছে সেই মহাপুরুষ নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তোমরা গিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর।"

"চল হরিদাস! চল শ্রীবাস পণ্ডিত॥
চাহ গিয়া দেখি কে আইলা কোন ভিত॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য়

হরিদাসের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই প্রথম আলাপের পরিচয়ই শ্রীল বৃন্দাবন দাসের ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু হরিদাসকে এখানে অতি পরিচিত ভক্তের ন্যায় আজ্ঞা করিলেন। পূর্ব্বেই শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে কোনও এক শুভদিনের শুভক্ষণে তাঁহাদের মধুর মিলন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। হরিদাস ও শ্রীবাস শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞানুসারে সমস্ত নবদ্বীপ খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে বাহির

করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গকে আসিয়া নিবেদন করিলেন,—

"দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব-নবদ্বীপ চাহি বুলয়ে হরিষে॥

* * *

আনন্দে বিহ্বল দুঁহে চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেকো উদ্দেশ কোথাও নাহি পায়॥
সকল নদীয়া তিন-প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহোঁ না দেখিয়া॥
নিবেদিল আসি দোঁহে প্রভুর চরণে।
উপাধিক কোথাহ নহিল দরশনে॥
কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ স্থূল।
পাষণ্ডীর ঘর-আদি—দেখিল সকল॥
চাহিলাঙ সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু! গিয়া আর গ্রাম॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য়

ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র মৃদু হাসিলেন। এই হাসির মর্ম্ম বড়ই নিগূঢ় তত্ত্ব। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহা পরিষ্কার বলিয়াছেন—

দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝায়েন 'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ'॥

* * *

অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
শ্রীচৈতন্য যারে জানায় সে জানিতে পারে॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য়

ক্ষণকাল পরে ঈষৎ হাসিয়া গৌরসুন্দর বলিলেন,—'আমার সাথে এস।'

বিষয়টি শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় যে ভাবে ভোগ (অনুভব) করিয়া উদ্‌গীরণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আনে বা বল জান্‌বে কেমনে
জানে না গৌরের নিজ-জনে

গৌরহরি,—না জানালে নিজগুণে—নিতাইধনে,—জানে না গৌরের নিজজনে

আসি',—নিবেদিলেন করযোড়ে
আমরা,—খুঁজিলাম নদীয়ার ঘরে ঘরে

কোথাও—দেখতে পেলাম না সে মহাপুরুষ-বরে—
আমরা,—খুঁজিলাম নদীয়ার ঘরে ঘরে

তখন, মৃদু-হাসিলেন গৌরহরি

প্রিয়গণের ঐ কথা শুনি—তখন,—মৃদু-হাসিলেন গৌরহরি
মৃদু-হাসিতে এই জানালেন
আমার—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ

আমি,—না জানালে কেউ জান্‌তে নারে—আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ

আমি,—না দেখালে কেউ দেখ্‌তে নারে—আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ

তখন,—ভাবাবেশে ঢুলি' ঢুলি'

শ্রীমুখে,—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলি'—তখন, ভাবাবেশে ঢুলি' ঢুলি'

নিজ-প্রিয়গণ-মেলি তখন,—ভাবাবেশে ঢুলি' ঢুলি'
চলিলেন নিত্যানন্দ-মিলনে
আনন্দ আর ধরে না

আজ,—বহুদিন-পরে মিলিবেন ব'লে—আনন্দ আনন্দ আর ধরে না
উপনীত নন্দন-আচার্য্যের ঘরে

শ্রীমুখে—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, ব'লে—উপনীত নন্দন-
আচার্য্যের ঘরে
গোপনে ছিলেন প্রভু-নিতাই
নিজ-ইষ্ট-ধ্যানানন্দে—গোপনে ছিলেন প্রভু-নিতাই
অকস্মাৎ হইল ধ্যানভঙ্গ
গৌর, মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—অকস্মাৎ হইল ধ্যানভঙ্গ
প্রাণে প্রাণে জান্‌লেন নিতাই
এসেছেন আমার প্রাণের ঠাকুর—প্রাণে প্রাণে জান্‌লেন নিতাই'
নইলে আমার;—প্রাণ ধ'রে কে বা টানে
আমার প্রাণের ঠাকুর বিনে—নইলে আমার,—প্রাণ ধ'রে কে বা টানে
[মাতন] উঠি' চলিলেন আগুসরি
ভেটিবারে প্রাণ-গৌরহরি—উঠি' চলিলেন আগুসরি—
অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ
শ্রী,—নন্দন-আচার্য্যের ঘরে—অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ
একবার ভাই কর রে স্মরণ
হৃদে ধ'রে শ্রীগুরু-চরণ—একবার ভাই কর রে স্মরণ!
এই আমাদের ভাবনার ধন—একবার ভাই কর রে স্মরণ
'এই আমাদের ভাবনার ধন'—
নিতাই-গৌরাঙ্গের মধু-মিলন—এই আমাদের ধন [মাতন]
একবার ভাই কর রে স্মরণ
আর,—কারও পদ চলে না
কারও মুখে না সরে রা—কারও পদ চলে না
দূরে পরস্পর হেরি'—কারও পদ চলে না
কারও মুখে না সরে রা—কারও পদ চলে না
না চলে পা, না সরে রা
নদীয়াতে হল প্রকট

যমুনাতীরের সেই রঙ্গ—নদীয়াতে হ'ল প্রকট

পহিলহি রাগ রে

মধুর-শ্রীব্রজ-লীলায়

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধিকা আশ্রয়

মধুর-নদীয়া-লীলায়

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়, শ্রীনিতাই আশ্রয়

পহিলহি রাগ রে

এ যে,—নিতাই-গৌরাঙ্গ-লীলার—পহিলহি রাগ রে

নাগর নাগরী, নাগরী নাগরের—পহিলহি রাগ রে

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গের—পহিলহি রাগ রে [মাতন]

দিনে দিনে বাড়্‌বে

অবধি ত' কেউ পাবে না—দিনে দিনে বাড়্‌বে [মাতন]

না চলে পা, না সরে রা

হইল,—দোঁহে,—থকিত-পারা ঠউর-হারা—না চলে পা, না সরে রা

কেবল,—দু'নয়নে বহে ধারা—না চলে পা, না সরে রা [মাতন]

দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

সাত্ত্বিক-বিকার যত—দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

'সাত্ত্বিক-বিকার যত'—

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—সাত্ত্বিক-বিকার যত

দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

প্রাণ,—গৌরের যত নিতাই এর তত—দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

দোঁহার,—শ্রীঅঙ্গ হ'ল বিভূষিত

অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভূষণেতে—দোঁহার,—শ্রীঅঙ্গ হ'ল বিভূষিত

তখন,—চিনিলেন গৌরাঙ্গগণ

অতিগূঢ় নিতাই-ধন—তখন,—চিনিলেন গৌরাঙ্গগণ
তখন,—ভাবাবেশে সবাই বলে
ওগো,—চিনেছি চিনেছি মোরা।
গুপত হইল বেকত—ওগো,—চিনেছি চিনেছি মোরা
এই ঠাকুর অবধূত
অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—এই ঠাকুর অবধূত [মাতন]
বিহরে নদীয়া-পুরে
ভাবাবেশে বলেন গৌরাঙ্গগণ—একাত্মা দুই দেহ ধরে
বিহরে নদীয়া-পুরে [মাতন]

নিতাই সঙ্গে মিলনের পর হইতে মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস আরম্ভ করিলেন। প্রতি রজনীতে কোনদিন শ্রীবাস মন্দিরে কোন দিন চন্দ্রশেখর ভবনে কীর্ত্তন হইত। এই নৃত্যগীতে কেবল মহাপ্রভুর পারিষদবর্গই উপস্থিত থাকিতেন। অন্য লোকের তথায় প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রভুর হুঙ্কার ও হরিধ্বনি আকাশ মুখরিত করিত।

"শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী-উপরে॥
হেন সে আছাড়ি প্রভু পড়েন নির্ভর।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড, সভে পায় ডর॥
সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি।
গোবিন্দ স্মরয়ে আই বুজি দুই আঁখি॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮

ভাবাবেশে কখনও ত্রিভঙ্গ সুন্দর মুরলীধারী বৃন্দাবনচন্দ্রের ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, আবার বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া দাস্য ভাবে দন্তে তৃণ ধরিয়া রোদন করিতেন। কখন বলিতেন—

"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ।
আমি সেই ভগবান, দেবকী নন্দন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী মাঝে আমি নাথ।
যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য়

ভক্তগণ স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে অহর্নিশ কাটাইতেন। শ্রীচন্দ্রশেখরের ও শ্রীবাসের গৃহ সেদিন নববৃন্দাবনে পরিণত হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দ সংসার ও আত্মীয় স্বজন ভুলিয়া গিয়া মহাপ্রভুর 'কীর্ত্তনরাসে' নৃত্য-কীর্ত্তনাদিতে আত্মহারা হইয়া বহির্জগতের সকলই ভুলিয়া যাইতেন। ঠাকুর হরিদাস এতদিন নির্জ্জনে সাধন করিতেছিলেন। এখানে 'আনন্দ বাজারে' আসিয়া অসংখ্য ভক্তের সহিত পরমানন্দ সুখে অষ্ট প্রহরই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব প্রসঙ্গে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। আস্বাদিতে রাধাপ্রেমমর্ম—প্রচারিতে নিজ নামধর্ম যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শচীনন্দনরূপে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

একদা তিনি নদীয়া বিহারী গৌরহরি স্বরূপেই শাস্ত্রপ্রোক্ত সর্ব্বঅবতার মূর্ত্তি সকল দেখাইয়া তিনিই যে 'পরতত্ত্বসীমা' এবং 'মহাবতারী' তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছিলেন।

এইভাবে তিনি সাতপ্রহর পর্য্যন্ত আবিষ্ট ছিলেন এইজন্য ইহা 'সাত প্রহরিয়া ভাব' নামে কথিত আছে। একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আসিলেন। একে একে সকল ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। প্রভুর ভাবাবেশ দেখিয়া ভক্তগণ চারিদিকে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভু বিষ্ণুর খট্টায় উঠিয়া বৈকুণ্ঠেশ্বরের ন্যায় উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ যোড় হস্তে আনন্দিত মনে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রভু নারায়ণের অভিষেকের মন্ত্রগীতি গাহিতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ হরষিত মনে গাহিতে লাগিলেন। তৎপরে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ভক্তগণ নারায়ণের অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিয়া সুবাসিত গঙ্গাজলে প্রভুকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করাইলেন। অনন্তর শ্রীঅঙ্গে দিব্য সুগন্ধি চন্দন লেপন করিলেন। চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। হরিদাস মুকুন্দ প্রভৃতি অভিষেক

মঙ্গল গাহিতে লাগিলেন। পতিব্রতাগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু বিষ্ণুখট্টোপরি বিরাজ করিলেন, নিত্যানন্দ রায় শিরে ছত্র ধরিলেন। নরহরি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ পাদ্য অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণ দ্বারা প্রভুর চরণ পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত মুরারি শ্রীধর প্রভৃতি পার্ষদগণ প্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু একে একে ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রভু হরিদাসকে নিকটে ডাকিয়া হাসিয়া আদর করিয়া বলিলেন "হরিদাস! আমার রূপ দেখ।" হরিদাস মহাসঙ্কুচিত হইয়া বহুদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। শ্রীগৌর ভগবান (পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া) হরিদাসকে আহ্বান করিয়া মধুর বচনে, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিতে লাগিলেন—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা' বড় দিল দুঃখ।
তাহা স্মরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুন শুন হরিদাস! তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ, চক্র ধরি করে।
নাম্বিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সভা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা' মারে যে সকল।
তুমি মনে চিন্ত' তাহাসভার কুশল॥
আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি লেখ'।
তখনেহ তা' সভারে মনে ভাল দেখ॥
তুমি ভাল দেখিলে না করোঁ মুঞি বল।
তোলোঁ চক্র, তোয়া লাগি সে হয় বিফল॥
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।

তোর পৃষ্ঠে পারোঁ তোর মারণ ॥
তোহোর মারণ নিজ-অঙ্গে করি লঙো।
এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কহোঁ ॥
যে বা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ, তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে ॥"

চৈ ভাঃ মধ্য ১১শ

গৌরহরি বলিলেন, "আমার এই দেহ হইতে তোমার দেহ বড়," শ্রীভগবান ভক্তের দেহে বিরাজ করেন। ভক্তের দৈহিক কষ্টে তাঁহার দৈহিক কষ্টানুভূতি হয়। হরিদাসের পৃষ্ঠদেশে দুর্ব্বৃত্ত যবনগণ যখন বেত্রাঘাত করিতেছিল প্রভু বলিলেন, সে সকল বেত্রাঘাত তাঁহারই শ্রীঅঙ্গে পতিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার শ্রীঅঙ্গ উন্মুক্ত করিয়া হরিদাসকে আঘাতের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখাইলেন। তাই প্রভু বলিলেন "আমার এই দেহ হইতে তোমার দেহ বড়!" ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডীদিগকো শিক্ষা দিবার জন্য ভক্তবৎসল গৌরহরি এই বলিয়া ভক্তমহিমা প্রচার করিলেন।

ইহার পরই প্রভু বলিলেন "হরিদাস! তোমার যে জাতি সেই জাতিই আমি বড় মনে করি।" হরিদাস যবন। প্রভু হরিদাসকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তবৃন্দকে ও জগৎবাসীকে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাইলেন।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত)

ভগবদ্ভক্তকে যদি কেহ শূদ্র, ব্যাধ, অথবা চণ্ডাল প্রভৃতি সামান্য জাতির সমান দেখে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়।

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তংনিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

তাই প্রভু হরিদাসের জাতির কথা তুলিয়া ভক্তবৃন্দকে বুঝাইলেন। ভক্ত যে জাতিই হউক না কেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব পূজ্য। তাহার পর প্রভু বলিলেন ভক্তদ্রোহীকে যথোপযুক্ত দণ্ড দিতে বৈকুণ্ঠ হইতে তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার সুদর্শন চক্র হরিদাসের পীড়নকারী পাষণ্ডী যবনদিগকে শাস্তি দিতে অসমর্থ হইল। কারণ হরিদাস তাঁহার পীড়নকারীদের কোনও অনিষ্ট প্রার্থনা করেন নাই। ভক্তের মনের ভাব বুঝিয়া ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবানকে কার্য করিতে হয়। হরিদাস তাঁহার পীড়নকারীদিগের উপর কোনরূপ নির্য্যাতন দেখিতে বাসনা করেন না। তাঁহার পক্ষে সুখ দুঃখ মানাপমান সকলি সমান। শত্রুপীড়ন অক্লেশে তিনি সহ্য করিতে শিখিয়াছেন। তিনি চাহেন না, যে তাহার পীড়নকারীদিগের শ্রীভগবান দণ্ড বিধান করেন। কাজে কাজেই শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র এস্থলে বিফল হইল। তখন তিনি কি করেন? তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ভক্তের পীড়ন দেখিতে না পাবিয়া স্বয়ং গিয়া পৃষ্ঠদেশে আবির্ভূত হইলেন। ভক্তের জন্য শ্রীভগবান সকলি করিতে পারেন।

"জ্বলন্ত-অনল কৃষ্ণ ভক্তলাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন-ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত-ভুবনে॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

প্রভু হরিদাসকে কহিলেন—

"যে বা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

দয়াময় ভক্তবৎসল গৌরহরির শ্রীমুখে এই সকল কারুণ্যপূর্ণ কথা

শুনিয়া হরিদাসের হৃদয়ে করুণা-মূর্ত্তির উদয় হইল। তিনি গদগদ ভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে কান্দিতে কান্দিতে ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবৃন্দ মহাভয়ে প্রণত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন তাঁর প্রিয় ভক্ত হরিদাসের ধূলিবিলুণ্ঠিত দেহের প্রতি একবার শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন।

"উঠ উঠ মোর হরিদাস!
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

প্রভুর কৃপাদেশে হরিদাসের বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি কিন্তু আর প্রভুর শ্রীমুখের প্রতি চাহিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবনের জন্য দয়াময় প্রভুর করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে, এই ভাবিয়া তিনি ফুঁপিয়া কান্দিতে কান্দিতে সমস্ত শ্রীবাসঅঙ্গনের ধূলায় গড়াগড়ি দিলেন; নয়নের ধারায় তিনি প্রভুর অপরূপ দর্শনানন্দ সুখ হইতেও মাঝে মাঝে বঞ্চিত হইলেন। তিনি কান্দিয়া কান্দিয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন।

"বাহ্য পাইল হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ-দরশন,—করয়ে ক্রন্দনে॥
সকল-অঙ্গনে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস পড়ে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

করুণাময় প্রভু করুণা করিয়া হরিদাসের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। হরিদাস বলপূর্ব্বক এবার ধূলিকর্দ্দমাক্ত কম্পমান্ কলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দয়াময় প্রভুর চরণে তাঁহার কত মনের কথা নিবেদন করিবার সাধ; কিন্তু মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। মনোবেদনায় তিনি অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু ভক্তের মনোভাব বুঝিয়া তাঁহার হৃদয়ে শক্তি দিলেন। তখন হরিদাসের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে গদগদ কণ্ঠে করুণাময় প্রভুর চরণে অতিশয় দীনভাবে যোড়হস্তে নিবেদন করিলেন—

"বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ!
পাতকীরে কর কৃপা, পড়িলুঁ তোমাত॥
নির্গুণ অধম সর্ব্ব জাতি-বহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু! তোমার চরিত॥
দেখিলে পাতক মোরে, পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু! তোমার আখ্যান।"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

তারপর বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভু! যে তোমার চরণ স্মরণ করে সে কীটতুল্য হইলেও তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর না। তুমি সভামধ্যে নিঃসহায়া শরণাগতা দৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে, পার্ব্বতীকে ডাকিনীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, প্রহ্লাদকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, পাণ্ডুপুত্রগণকে দুর্ব্বাসার শাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। ঘোর পাপী অজামিলকে মৃত্যুকালে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিবার জন্য মুক্তিপদ দান করিয়াছিলে। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"স্মরণ করিলে মাত্র—রাখ তুমি দীন॥
সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্যোধন দুঃশাসন॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা স্মরিলা।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা॥
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত॥
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া॥
প্রহ্লাদ করিল তোর চরণ স্মরণ।
স্মরণ-প্রভাবে সর্ব্বকৃত্য বিমোচন॥
পাণ্ডুপুত্র স্মরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।

অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে ॥
অবশেষ এক শাক আছিল হাণ্ডীতে।
সন্তোষে খাইলা নিজ ভকত রাখিতে ॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে।
সেইমত সব ঋষি পলাইলা জলে ॥
স্মরণ প্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক সব স্মরণ-কারণ ॥
অখণ্ড স্মরণধর্ম্ম ইহা সভাকার।
তেঞি চিত্র নহে ইহা সভার উদ্ধার ॥
অজামিল-স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্বধর্মহীন তাহা বই নাহি আর ॥
দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি পুত্রমুখ।
স্মরিল পুত্র নাম 'নারায়ণ' রূপ ॥
সেই ত স্মরণে সব খণ্ডিল আপদ।
তেঞি চিত্র নহে—ভক্ত স্মরণ-সম্পদ ॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

কিন্তু আমি তোমার চরণ স্মরণহীন। তথাপি প্রভু তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না।

শ্রীগৌর ভগবান প্রেমভাবে পরম আবিষ্ট হইয়া মস্তক ঢুলাইতে ঢুলাইতে হরিদাসের আবেগপূর্ণ আত্মনিবেদন গান শুনিতেছেন, আর প্রেমানন্দে অস্থির হইয়া মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার করিতেছেন। হরিদাস কান্দিতে কান্দিতে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে নিবেদন করিলেন,

"তোমা দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার।
এই বই প্রভু! কিছু না চাহিব আর ॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

এই কথা বলিয়া দৈন্যাবতার হরিদাস করযোড়ে প্রভুর অনুমতি অপেক্ষা করিলেন। শ্রীগৌর ভগবান প্রেমানন্দে অধীর হইয়া হুঙ্কার করিয়া কহিলেন—

"বোল বোল—সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

সাহস পাইয়া হরিদাস তখন কাতরকণ্ঠে করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

"মুঞি অল্প-ভাগ্য প্রভু! করোঁ বড় আশ॥
'তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভোজন মোর হউ জন্মজন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম॥'
তোমার স্মরণ-হীন পাপ জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥
এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহা-পদ চাহো—যে মোহর যোগ্য নয়॥
প্রভুরে নাথ রে মোর বাপ্ বিশ্বম্ভর!
মৃত মুঞি, মোর অপরাধ ক্ষমা কর॥
শচীন নন্দন বাপ! কৃপা কর' মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥' চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

ভক্ত চূড়ামণি 'হরিদাস' দৈন্যের অবতার। তাঁহার এই বর প্রার্থনা জগতে অতুলনীয়। যেমন করুণার অবতার, দয়ার মহাসাগর আমার ভক্তবৎসল, গৌরহরি, তেমনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত দৈন্যের অবতার, 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের মূর্ত্ত প্রতীক ঠাকুর হরিদাস।

হরিদাস যখন পুনঃপুনঃ কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহার উপরোক্ত অপূর্ব্ব প্রার্থনার পুনরুক্তি করিতে লাগিলেন, ভক্তবৎসল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গদ গদ কণ্ঠে মধুর বচনে অতিশয় স্নেহ ভাবে হরিদাসকে বলিলেন—

"—শুন শুন মোর হরিদাস!
দিবসেকো তোমা সঙ্গে কৈল যেই বাস॥

তিলার্দ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাইব, নাহিক অন্যথা॥
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর আছি আমি তোমায় শরীরে।
তুমি—হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিবে সর্ব্বকাল॥
মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনি অপরাধে তোরে ভক্তি দিল দানে॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

প্রভু যখন হরিদাসকে এই অপূর্ব্ব বরদান করিলেন তখন ভক্তদল হইতে মহানন্দে জয় জয় ধ্বনি উঠিল। ভক্তবৎসল গৌরহরির কমল নয়নে ধারা লক্ষিত হইল। হরিদাস প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন এবং গৌর হরির এই অযাচিত অপার করুণার কথা মনে করিয়া সদৈন্য গদগদ ভাবে তিনি কাঁদিয়া আকুল।

ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

"জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে—না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ—'যবন হরিদাস'।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্মজন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে॥
হরিদাস—স্তুতি-বর শুনে সেই জন।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥

এ বচন মোর নহে, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
'ভক্তাখ্যান' শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়ে ॥
মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস স্মরণে সকল পাপ ক্ষয় ॥
সর্ব্বমতে মহা ভাগবত হরিদাস।
চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস ॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নাটকাভিনয়ে

প্রায় ৪৬০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে প্রথম বাংলা ভাষায় নাটকাভিনয় হয়। ইতিপূর্ব্বে বাংলাভাষায় কোন নাটক হইয়াছে বলিয়া জানি না। নাটক প্রচারের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

নিজ 'ইচ্ছাশক্তি' নিতাইকে ডাকিয়া গৌরহরি একদিন বলিলেন—"আজ আমরা আচার্য চন্দ্রশেখরের গৃহে—কৃষ্ণলীলাভিনয় করিব।" নিতাই হাসিয়া বলিলেন,—"প্রভু! তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে,—এ কার্য্য অদ্যই হইবে।" প্রভু বুদ্ধিমন্ত খান এবং সদাশিব কবিরাজকে ডাকিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা আসিলে গৌরহরি মৃদু হাসিয়া মধুর বচনে বলিলেন—"তোমরা দুইজনে আচার্য্যরত্নের গৃহে কৃষ্ণ-লীলাভিনয়ের সমস্ত উদ্যোগ কর, অদ্য রাত্রে অভিনয় হইবে। অলঙ্কার বস্ত্রাদি ও অভিনয় উপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির বন্দোবস্ত শীঘ্র কর।" এই বলিয়া গৌরহরি তাঁহাদের বিদায় দিয়া সকল ভক্তবৃন্দকে ডাকাইয়া কাহাকে কি সাজিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন—

"গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তার-বুড়ি—সখি সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল 'হরিদাস'—জাগাইতে ভার॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮শ

প্রভু আরও বলিলেন, হরিদাস সূত্রধর হইবেন।—মুকুন্দ পারিপার্শ্বিক। বাসুদেব আচার্য্য বেশবিন্যাসকারী হইবেন। আর স্বয়ং নিত্যানন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকারিণী ভগবতী যোগমায়া জরতীসদৃশ হইয়া লীলাভিনয় করিবেন।

নবদ্বীপে এরূপ কৃষ্ণযাত্রা এই প্রথম অভিনীত হইতেছে, বৈষ্ণববৃন্দ আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান এবং সদাশিব কবিরাজ শ্রীপাদ আচার্য্যরত্নের বাটীতে অভিনয়ের সমস্ত উদযোগ করিলেন। বড় বড় চন্দ্রাতপ আনিয়া আঙ্গিনায় খাটাইলেন। জনসাধারণের বসিবার আসন আনিয়া ভূমিতে পাতিলেন। বস্ত্র, অলঙ্কার, কৃত্রিম দাড়ি, গোঁফ, কাঁচুলী, শঙ্খ, চামর প্রভৃতি যাত্রায় উপযোগী নানাবিধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পত্র পুষ্পে গৃহদ্বার সজ্জিত করিলেন। সন্ধ্যাকালে দীপালোকের বন্দোবস্ত করিলেন। গৌরহরি স্বয়ং আচার্য্যরত্নের গৃহে গিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অদ্বৈত, নিতাই, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ আছেন। রঙ্গিয়া গৌরহরি ভক্তবৃন্দের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—

"প্রকৃতি-স্বরূপে নৃত্য হইব আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়—তার অধিকার॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥"

জিতেন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারও সে নৃত্য-বিলাস দর্শন করিবার অধিকার নাই শুনিয়া সকলে বিমর্ষ হইলেন। সর্ব্ব প্রথমে অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন—

"আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য্য।
আমি সে অজিতেন্দ্রিয়, না যাইব তথা॥"

চৈঃ ভাঃ যধ্য ১৮শ

তৎপরে শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন—"মোরও ঐ কথা"

অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীবাসপণ্ডিতের কথা শুনিয়া গৌরহরি হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা কেহ যদি না যাইবে, তবে কাহাকে লইয়া আমি এই লীলা রঙ্গ করিব? আচ্ছা কৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমরা আমার মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া কেহ মোহ প্রাপ্ত হইবে না।"

চন্দ্রশেখরের কি ভাগ্য! গৌরহরি বৈষ্ণবগণসহ তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া সকলকে অভিনয়োপযোগী নিজ নিজ বেশ ধারণ করিতে দিলেন। এই অভিনয়ে কে কি সাজিবেন তাহা পূর্ব্বে স্থির করিয়া দিয়াছেন। অদ্বৈতপ্রভু কি সাজিবেন তাহা বলেন নাই। সুতরাং অদ্বৈতপ্রভু গৌরসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করি—

"মোরে আজ্ঞা প্রভু! কোন্ কাচ কাচিবার?"

গৌরহরি হাসিয়া উত্তর করিলেন—

"যত কাচ—সকল তোমার" তাৎপর্য্য, তুমি শ্রীকৃষ্ণ সাজিবে আর আমি সাজিব শ্রীরাধা।

শ্রীপাদ চন্দ্রশেখরের গৃহে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভক্তবৃন্দ আসিয়া একত্রিত হইলেন। বৈষ্ণব গৃহিণীগণ কৃষ্ণযাত্রা দেখিতে চলিলেন। শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে হইয়া ভগ্নি সর্ব্বজয়ার বাড়ীতে চলিলেন। অভিনয় অঙ্গন ভক্তগণে পূর্ণ হইল। আচার্য্যরত্নের অন্তঃপুর স্ত্রীলোকে ভরিয়া গেল। প্রভুর আদেশে বহির্দ্বার বন্ধ হইল।

অভিনয় আরম্ভ হইল। সর্ব্ব প্রথমে মুকুন্দের দল মৃদঙ্গ মন্দিরা—বাদ্যযন্ত্র যোগে সুমধুর 'সঙ্গৎ' আরম্ভ করিলেন। সুমধুর বাদ্য নিনাদে শ্রোতৃবর্গের মন প্রাণ প্রফুল্লিত হইল। প্রেমানন্দে সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সঙ্গৎ শেষ হইলে গায়কগণ সমস্বরে সুললিত সুরতাললয় সংযোগে মঙ্গলাচরণ করিলেন—

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎস্বৈর্দ্দোভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

"কুচ কলস ভরাঢ্য-কেশরী ক্ষীণ মধ্যা।
বিপুলতরনিতম্বী পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী॥

প্রণয়তর বয়স্যা স্কন্ধবিন্যাস্ত হস্তা।
নিধুবন রসপুঞ্জং যাতি রাধা নিকুঞ্জং ॥"

(গৌরসুন্দরের স্বরচিত)

তাহাব পর মুকুন্দ কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন। সুমধুর মৃদঙ্গ মন্দিরা করতালযোগে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের শুভারম্ভ হইল।

কীর্ত্তন শেষ হইলে হরিদাস ঠাকুর রঙ্গভূমিতে বৈকুণ্ঠের কোটালরূপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে এক জোড়া বড় গোঁফ,—গলদেশে মালা,—স্কন্ধদেশে বৃহৎ যষ্ঠী,—মস্তকে বড় একটা পাগড়ী—কর্ণে কুণ্ডল—পরিধানে ধটি, চরণে নূপুর। তিনি সকলকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন—

"আরে আরে ভাই-সব! হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮শ

এই বলিয়া হস্তে যষ্ঠী লইয়া ঠাকুর হরিদাস প্রেমভরে সর্ব্ব আঙ্গিনায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর সকলকে উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বোল কৃষ্ণ-নাম"

প্রেমাশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী দৃষ্ট হইতেছে। তিনি প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া আঙ্গিনার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হরিদাস ঠাকুরের বেশভূষা দেখিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই প্রেমানন্দে হাসিতেছেন। সকলে তাঁহাকে পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কে তুমি এখানে কেন?"

হরিদাস যষ্টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—

—"আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।

প্রেমভক্তি লুটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা ॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে ॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮শ

এই বলিয়া তিনি জোড়া গোঁফে চাড়া দিয়া মুরারিগুপ্তের সহিত সদম্ভে রঙ্গস্থলের চতুর্দ্দিকে বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে নারদের বেশে শ্রীবাসপণ্ডিত রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ নারদের বেশ দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতপ্রভু প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—

"কে তুমি আইলা এথা কেমন কারণে ?" শ্রীবাসপণ্ডিত গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—

"শুন কহিয়ে কথনে—
নারদ আমার নাম, কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ—কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাঙ কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে ॥
শূন্য দেখিলাঙ বৈকুণ্ঠের ঘর-দ্বার।
গৃহিণী—গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার ॥
না পারি রহিতে—শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া
আইলাঙ আপন ঠাকুর স্মঙরিয়া ॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ ॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮শ

সকলেই নারদের বাক্য শুনিয়া ও বেশ দেখিয়া মহোল্লাসে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। শচীমাতা শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন।

রঙ্গগৃহে গৌরহরি ভুবনমোহিনী বেশে স্বয়ং লক্ষ্মী সাজিতেছেন। গদাধর তাহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। অকস্মাৎ গৌরহরি রুক্মিনী ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। রঙ্গগৃহ মধ্যে বসিয়া তিনি আপনাকে পূর্ব্বলীলার বিদর্ভসুতা মনে করিয়া কৃষ্ণবিরহে নয়নজলে বক্ষ ভাসাইলেন। নয়নজলরূপ মসী দ্বারা অঙ্গুলী লেখনী দিয়া পৃথিবীতলে তাঁহার মনোচোর যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম-পত্রী লিখিতে বসিলেন।

গুণমণি গৌরসুন্দর রুক্মিনীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া ভাগবতীয় শ্লোক পাঠ করিতেছেন—আর নয়নের প্রেম জলে বক্ষ ভাসাইতেছেন। এদিকে রঙ্গমঞ্চ হরিদাসঠাকুরের প্রেমমাখা উচ্চ হরিধ্বনির সহিত 'জাগ জাগ' শব্দে প্রকম্পিত হইতেছে। নারদের বেশে শ্রীবাসপণ্ডিতের মধুর হরিগুণগানে শ্রোতৃবর্গের প্রাণে শিহরণ জাগিতেছে।

প্রথম প্রহর রাত্রিতে হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস পণ্ডিতের লীলারঙ্গ অভিনীত হইলে, দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর পণ্ডিত ভুবনমোহিনী ললিতা-বেশে-সুপ্রভা সখীর অঙ্গে ভর দিয়া ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রমণী বেশটি রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া রূপসাগর যেন উছলিয়া উঠিয়াছে,—তাঁহার অপূর্ব্ব রূপচ্ছটা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিতের সহিত বৃদ্ধা বড়াই বুড়ির বেশে মধ্যদেশ বঙ্ক করিয়া নিত্যানন্দপ্রভু হস্তে যষ্টি, কক্ষে ডালি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।

হরিদাস ঠাকুর যষ্টি ধারণ করিয়া তাঁহার বড় বড় গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে অভিনয় প্রাঙ্গনের চতুর্দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার বদনে মধু হরিনামধ্বনি—দু'নয়নে অবিরল আনন্দধারা বহিতেছে।

অতঃপর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত অদ্বৈতপ্রভু রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মদন মোহন শ্রীকৃষ্ণের বেশ; অদ্বৈতপ্রভুকে দেখিয়া সভাস্থ সকলে উঠিয়া অভিবাদন করিলেন এবং জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন;

বড়াইবুড়ি স্বয়ং নিত্যানন্দপ্রভু। বড়াইবুড়ির সহিত দুইটি পরমাসুন্দরী যুবতী দেখিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমরা আজ রাত্রিতে কোথায় থাকিবে ?

এই কথা শুনিয়া বড়াইবুড়ির মনে বড় রাগ হইল। তিনি ভাবিলেন স্ত্রীলোক দেখিয়া ইহারা বুঝি কৌতুকরঙ্গ করিতেছেন। বড়াইবুড়ি পরম রসিকা। রসপুষ্টির জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। রসের ভাণ্ডার লইয়া তিনি বসিয়া আছেন। জরতী হইয়াও তিনি পূর্ণ যুবতীর ন্যায় রসবতী। তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে গিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—

তুমি কি তোমার গৃহে আমাদের একটু স্থান দিবে না ?

ললিতার বেশে গদাধর পণ্ডিত সুপ্রভা সখির সহিত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বড়াইবুড়ির কথা শুনিয়া তিনি বদনে বসন ঝাপিয়া ঈষৎ মধুর হাস্য করিলেন।

বৃদ্ধ গঙ্গাদাস পণ্ডিত রসিক পুরুষ নহেন। বড়াইবুড়ির এইরূপ রসকথা শুনিয়া তাঁহার মনে রাগ হইল। তিনি রস কথার অরসিকের মত উত্তর দিলেন—

"তুমি বুড়া হইয়াছ। তোমাকে ভাল কথা বলিলে তুমি উল্টা বুঝ। তোমার সঙ্গে আর আমার কোন কথায় কাজ নেই। এখন শীঘ্র এ স্থান হইতে তোমরা বিদায় হও "

বড়াইবুড়ি ইহা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে কটূক্তি করিলেন। দুইজনে কলহ বাধিল। এই কলহ মিটাইতে রসিক চূড়ামণি কৃষ্ণবেশধারী অদ্বৈতপ্রভু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড়াইবুড়ির প্রতি চাহিয়া তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

—"এত বিচারে কিবা কাজ
মাতৃসম পরনারী কেন দেহ লাজ।
নৃত্য গীত প্রিয় বড় ঠাকুর আমার।
এথায়ে নাচহ ধন পাইবা প্রচুর॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮শ

এই কথায় বড়াই বুড়ি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া অদ্বৈত প্রভুকেও নানাবিধ কটূক্তি করিয়া গালি দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই হাসিয়া আকুল হইলেন। প্রেমানন্দে জয় জয় ধ্বনিতে সর্ব্বস্থান পূর্ণ হইল।

গদাধর পণ্ডিত নয়নরঞ্জন নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ঘন ঘন হরিধ্বনিতে রঙ্গস্থল পূর্ণ হইল। চতুর্দ্দিকে আনন্দ কোলাহল শ্রুত হইল। গদাধর মধুর সুর ধরিয়াছেন। তাহাতে যেন অমৃতবৃষ্টি হইতেছে।

এইসময়ে 'গোরা-নটরাজ' তাঁহার আদ্যাশক্তির ত্রিভুবনমোহিনী বেশ ধারণ করিয়া ধীরপদে রঙ্গমঞ্চে শুভাগমন করিলেন। বড়াই বুড়ির বেশধারী নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার আগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মোহিনীবেশে গৌরহরি নৃত্যগীতকারী অভিনায়ক ভক্তগণের সহিত লঘু লঘু মৃদঙ্গধ্বনি এবং তাল মান লয় সহকারে মধুর হাব ভাব প্রকাশ করিয়া নরনরঞ্জন মধুর নৃত্যবিলাস রঙ্গে মগ্ন হইলেন। তখন দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। তিনি যখন নৃত্যোল্লাসে পুনঃ পুনঃ চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভ্রমর কুঞ্চিত কেশকলাপ হইতে সুগন্ধ কুসুমস্তবক সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। গৌরহরির মোহিনীমূর্ত্তির কান্তিচ্ছটার আলোকে রঙ্গালয়ের আলোকমালা নিষ্প্রভ বোধ হইল। গৌরের ভুবনমোহিনী নারীর বেশ দেখিয়া তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিলেন না।

তাঁহার কৃপায় এই ভুবনমোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সকলের মনে তাঁহার প্রতি জগজ্জননী ভাবের উদয় হইল—গৌরসুন্দর জগজ্জননীভাবে আবিষ্ট হইয়া মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীমানপণ্ডিত সম্মুখে প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর হরিদাস দর্শকবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে।

এক্ষণে প্রভু মোহিনীবেশে বড়াই বুড়ির হাত ধরিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। হঠাৎ নিত্যানন্দ বিহ্বল হইয়া প্রেমানন্দে অধীর হইয়া টলমল করিতে লাগিলেন—বড়াই বুড়ির অপূর্ব্ব কৃত্রিম সাজসজ্জা সকল

দূর হইয়া গেল। অদ্বৈতপ্রভুও তখন প্রেমবিহ্বল হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। তাঁহারও ভুবনভুলান সাজসজ্জা সকল শিথিল হইয়া গেল। প্রভুকে দেখিয়া সকলের মনে পরম পবিত্র মাতৃভাব জাগিয়া উঠিল। তখন, মৃদু পদবিক্ষেপে পরম আবিষ্টভাবে অভিনয়স্থল হইতে গৌরহরি আচার্য্যরত্নের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীগোপীনাথ দেবকে ক্রোড়ে করিয়া পরম ঐশ্বর্য্যময়ী মহালক্ষ্মীভাবে একেবারে বিষ্ণুখট্টার উপরে গিয়া বসিলেন। রাত্রি অবসানের সহিত প্রভুর এই মধুর লীলারঙ্গেরও অবসান হইল। তাঁহার এখন সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য ভাব। ভক্তগণ জগজ্জননী-রূপে প্রভুর স্তবপাঠ করিলেন। এক্ষণে সকলেরই পুত্রভাব—প্রভুর মাতৃভাব, প্রভু প্রথমে ঠাকুর হরিদাসকে ক্রোড়ে করিয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। একে একে সকল ভক্তজনকে সস্নেহে ক্রোড়ে করিয়া স্তনপান করাইলেন।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"যুগধর্ম্ম" নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারে—

গৌরহরির পতিত-উদ্ধার লীলাটি বড়ই মাধুর্য্যময় গৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—ভগবৎ স্বরূপে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন—যুগধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার বা পতিত উদ্ধার লীলা রঙ্গ এ-পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা হইল এই অপূর্ব্ব ও শ্রেষ্ঠ লীলারঙ্গের একটি অভিনয় করিবেন। এই লীলার প্রধান সহায়ক ঠাকুর হরিদাস ও প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ।

ইতিপূর্ব্ব ঠাকুর হরিদাসের প্রধান সহযোগী ছিলেন অদ্বৈত আচার্য্য। তারপর প্রধান সহযোগী হইলেন প্রভু নিতাই। গোরা গুণমণি তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার কার্য্যের ভার শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিতাইচাঁদের উপর বিশেষভাবে অর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি হঠাৎ হরিদাস ও নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস!
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শঃ

আজ্ঞা পাইয়া নিতাই ও হরিদাস দুইজনে নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর যাহাকে দেখেন তাহাকে বলিতে লাগিলেন—

"বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ যে জীবন॥
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই! হই এক মন॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ

দুই জনেরই গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের বেশ। তাঁহারা উর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমানন্দে নামকীর্ত্তন করেন আর নদীয়াবাসীদিগকে যুগধর্ম্ম শিক্ষা দেন। যার ঘরে যান তিনিই সসম্ভ্রমে ভিক্ষা দিতে চাহেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস বলেন,—

"ভাই! আমাদের এই ভিক্ষা—কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা"।

সুজনেরা দুইজনের মুখে এই অপরূপ কথা শুনিয়া সুখী হইতেন। কেহ কৃষ্ণ নাম নিতে প্রতিশ্রুত হইতেন; কেহ বা বলিতেন, "তোমরা মত্ততা দোষে পাগল হইয়াছ। নিজেরা পাগল হইয়া এখন আমাদিগকে পাগল করিতে আসিয়াছ।" যাহারা গৌরহরির নৃত্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল—তাহাদের বাড়ী গেলে তাহারা মার মার শব্দে তাড়াইয়া দিত। কেহ কেহ বলিত,—এগুলা চোর, সন্ন্যাসী বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিত্যানন্দ ও হরিদাস এ সকল লোকদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। প্রতিদিন উচ্চনাম সঙ্কীর্ত্তন সহকারে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া দিবা অবসানে আসিয়া গৌরহরির নিকট সকল সংবাদ বিবৃত করিতেন।

এইরূপে এই দুই পুরুষ রতন গৌরসুন্দরের আদেশ প্রতিদিন পালন করিতেছেন। একদিন নদীয়ার পথে দুইজন মাতালের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ইহাদেরই নাম জগাই মাধাই।

শ্রীললোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ইহাদের পরিচয়—

"মহাপাপী ব্রাহ্মণ যে আছে দুই ভাই।
নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই॥
ব্রাহ্মণী, যবনী, গুর্ব্বাঙ্গনা নাহি এড়ে।
সুরাপান পাইলে সকল কর্ম্ম ছাড়ে॥

দেব-গুরু ব্রাহ্মণের হিংসা নিরন্তর।
বাহির হইলে বিনা বধে না যায় ঘর॥
ব্রহ্মবধ, গোবধ, স্ত্রীবধ শত শত।
লিখিতে না পারি—পাপ করিয়াছে কত॥
গঙ্গাকুলে বৈসে—গঙ্গাস্নান নাহি করে।
দেবতা পূজয়ে নাহি—আজন্ম ভিতরে॥"

মহাদস্যুপ্রায় এই দুই মদ্যপ পথপ্রান্তে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। আর কখন কখন কিলাকিলি গালাগালি করিতেছে। প্রভু নিতাই ও ঠাকুর হরিদাস পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কোন্ জাতি এবং ইহাদের এরূপ অবস্থাই বা কেন?" তাহারা উত্তর করিল, "ঠাকুর ইহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের পিতা মাতার চরিত্রে কোন দোষ নাই। কিন্তু ইহারা জন্মাবধি দুশ্চরিত্র। চুরি, ডাকাতি, গৃহদাহ, মদ্য, গোমাংস ভক্ষণ ইত্যাদি এমন পাপ নাই যাহা ইহারা করে নাই। ইহাদের ভয়ে নদীয়াবাসী লোকজন সর্ব্বদা ত্রস্ত।" এইসব কথা শুনিয়া নিত্যানন্দের করুণহৃদয় বিগলিত হইল এবং তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পাপী উদ্ধারিতে প্রভু কৈল অবতার।
এমন পাতকী কোথা পাইবেন আর॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ

তিনি আরও একটি বিষয় চিন্তা করিলেন যে 'যুগধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন' প্রচার কার্য্যে দুর্জ্জন ও পাষণ্ডগণ নানা কথা বলে—উপহাস করে। প্রভু যদি এই দুইজনকে অনুগ্রহ করেন তবে ত প্রভুর প্রভাব সংসারের লোক জানিতে পারিবে। এখন যেমন এ দুইজন মদে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়াছে, সেইরূপ যদি শ্রীকৃষ্ণ নামে মত্ত হইয়া ক্রন্দন করে তবে আমার যত পর্য্যটন সার্থক হয়। লোকে ইহাদিগকে দেখিয়া গঙ্গা স্নান সদৃশ পুণ্য অনুভব করে তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

নিজ মনের কথা গোপন করিয়া রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদ ঠাকুর হরিদাসকে

বলিলেন—হরিদাস! ইহাদের দুর্গতি দেখ। ব্রাহ্মণ হইয়া এমন দুই ব্যবহার করে, ইহাদের কি গতি হইবে? যে যবনেরা তোমাকে প্রাণান্ত করিয়া মারিল, তুমি তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিলে। তুমি যদি ইহাদের মঙ্গল চিন্তা কর তবে এ দু'জন মুক্তি পায়। প্রভু তোমার সঙ্কল্প কখনো অন্যথা করেন না, একথা তিনি নিজে বলিয়াছেন। তোমার কৃপায় যদি এই দুই ব্রহ্মদস্যুর উদ্ধার হয় তাহা হইলে আমাদের প্রভু যে 'পতিতপাবন' তাহা জগতের লোক সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে পাইবে। পুরাণে অজামিল উদ্ধার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে মাত্র; কেহ তাহা চক্ষে দেখেন নাই। সর্ব্বসমক্ষে প্রভু যদি এই দুই দুর্বৃত্ত বিপ্রকুমারদের কেশে ধরিয়া উদ্ধার করেন, তাহা হইলে তাঁহার 'অবতার-মহিমা' কলি জীবের হৃদয়ে সুদৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল হইবে।" নিত্যানন্দ যে গৌরহরির 'মূল-ইচ্ছাশক্তি' তাহা ঠাকুর হরিদাস উত্তমরূপে জানেন। দৈন্যের মূর্ত্তি ঠাকুর হরিদাস উত্তর করিলেন,—"প্রভু! তোমার যে ইচ্ছা প্রভুরও সেই ইচ্ছা নিশ্চয় হইবে। আমাকে ভাঁড়াও কেন?" প্রভু নিতাই এ কথা শুনিয়া হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "চল, প্রভুর আজ্ঞা হইয়া মদপদের নিকট যাই। আমাদের উপরে মাত্র বলিবার ভার। ফলাফল বিচার করিবার আমাদের অধিকার নাই। অনন্তর নিতাই ও হরিদাস গৌরহরির আজ্ঞা বলিবার জন্য দুইজনের নিকট গমন করিলেন। পার্শ্বস্থ লোকেরা বলিতে লাগিল, "খবরদার নিকটে যাইও না। আমরা দূরে থাকিয়াই ভীত হই, আর তোমার কোন্ সাহসে নিকটে যাইতেছ। যাহারা গো-বধ ব্রাহ্মণ বধ করিতে দ্বিধা করেনা তাহাদের আবার সন্ন্যাসী জ্ঞান কি?" সকলের নিষেধ বাক্য শুনিয়াও দুইজনে মহা কৌতূহল চিত্তে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নিকটে চলিলেন। উভয়ে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'প্রভুর আজ্ঞা' বলিতে লাগিলেন—

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥

তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, ছাড় সব অনাচার॥"

চৈঃ ভাঃ লধ্য ১৩শ

এই কথা শুনিবামাত্র দুই দস্যু ক্রোধে রক্তিম লোচন হইয়া ধর ধর্ বলিয়া দুই সন্ন্যাসীকে আক্রমণ করিতে গেল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ কৌতুকের সহিত হাসিতে হাসিতে তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই যেন সেই দস্যুদ্বয়কে প্রলুব্ধ করিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। আর দস্যুদ্বয়ও ধরি ধরি করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। লোকেরা বলিতে লাগিল, সন্ন্যাসীরা আমাদের নিষেধ বাক্য না শুনিয়া এই বিপদে পড়িল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ দৌড়াইতে দৌড়াইতে কৌতুকের আনন্দ কোন্দল করিতে লাগিলেন।

দস্যুরা অনুসরণ করিতে করিতে বলিল, "আজ জগাই-মাধাইর নিকট কেমনে এড়াও দেখিব।" সে কথা শুনিয়া দুইজনে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করিতে করিতে মৃদুমন্দ গতিতে ছুটিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিলেন,—"আমি চলিতে পারিনা জানিয়াও চঞ্চলের সহিত আসি, কাল যবনের হাত হইতে কৃষ্ণ একবার বাঁচাইলেন। আজ চঞ্চলের বুদ্ধিতে প্রাণ হারাইলাম।

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন—"আমি চঞ্চল নই। মনে ভাবিয়া দেখ তোমার প্রভুটি যে বিহ্বল। ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ আজ্ঞা করে। তাঁহার আজ্ঞা মতে আমরা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই।"

এইরূপ আনন্দ কোন্দল করিতে করিতে তাঁহারা প্রভুর বাড়ীর নিকট আসিলেন। এদিকে দস্যুরা সন্ন্যাসীদের পথ ঠিক করিতে না পারিয়া নিজেরাই মদের নেশায় মারামারি আরম্ভ করিল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ দস্যুদ্বয়কে প্রলুব্ধ করিলেন—সেদিন ধরা দিলেন না। পরস্পর কোলাকুলি করিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে মহাপ্রভুর নিকট দিবসের বৃত্তান্ত বলিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিত সেই দস্যুদ্বয়ের ইতিহাস বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিলেন।

গোরাশশী জগাই মাধাইএর ইতিহাস শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলে নিত্যানন্দ বলিলেন,—"প্রভু! রাগ ছাড়। আগে এই দুইজনকে গোবিন্দ বলাও। ধার্মিকেরা স্বভাবতঃই কৃষ্ণনাম বলে। যদি এই দুই পাপীকে ভক্তিদান করিয়া উদ্ধার কর তবে সে 'পাতকিপাবন' নামের মাহাত্ম্য প্রচার হয়।

গৌরসুন্দর মধুর হাসিয়া উত্তর করিলেন—"যখন ইহারা তোমার দর্শন পাইল তখনই ইহাদের উদ্ধার হইল। বিশেষতঃ তুমি যখন ইহাদের মঙ্গল চিন্তা কর তখন শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ইহাদের মঙ্গল সাধন করিবেন।"

অদ্বৈত আচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে পরিহাস করিয়া বলিলেন—

মদ্যপের উচিত—মদ্যপ সঙ্গ হয়ে॥
তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত?"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণে ও নীলাচল গমনে

(১)

নবদ্বীপ বিহারী গৌরের প্রতিটি লীলার সহায় ঠাকুর হরিদাস। যে দিন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন সে দিনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিতাই, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ গিয়াছিলেন। এবং তাঁহারা সন্ন্যাসের কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপে ছিলেন। মাথুরের গৌরচন্দ্রিকায়—হরিদাস ঠাকুরের নাম আছে।

"নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
ভাসিল জগত সব শোকের সায়রে॥"

তারপর ভক্তদের দশা বর্ণনে ঠাকুর হরিদাসের কথা এইরূপ আছে—

"কান্দিছেন হরিদাস দু আঁখি মুদিয়া"

যাঁহার সংসারে কোন মায়ার বন্ধন নাই এবং যিনি নিরাসক্ত পুরুষ তিনি আজ অঝোর নয়নে কান্দিতেছেন! ধন্য হরিদাসের গৌর-প্রীতি!

(২)

গৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাটোয়া হইতে বৃন্দাবনপথে গমন করিলে—নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁহাকে ফিরাইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আনিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ভবনে গৌরসুন্দর পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার দর্শনাকাঙ্খায় সহস্র সহস্র লোক আসিয়া দ্বার দেশে একত্রিত হইলেন। দৌবারিকগণ বিনীত ভাবে উপস্থিত জনসংঘট্টকে বলিতেছে—"তোমরা কোলাহল করিও না—স্থির হইয়া এখানে ব'স, তোমাদের ঠাকুরটি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এখন পর্য্যন্ত অনাহারে আছেন। অদ্য এখানে তিনি ভিক্ষা করিবেন। তাঁহার আহার হইলে দর্শন পাইবে।"

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। সীতা ঠাকুরাণী নানাবিধ ভোজ্য বস্তু রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত করিলেন। অদ্বৈতগৃহে 'মদন গোপাল' সেবা আছেন। অদ্বৈত প্রভু প্রথমে ধাতুপাত্রে শ্রীশ্রীমদনগোপালের ভোগ বাড়িতে বলিলেন।

তাঁহার আদেশে আরও দুইটি ভোগ পৃথক করিয়া বত্রিশ আঠিয়া কদলী-পত্রে বাড়া হইল। এই দু'টি ভোগ একটি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্য এবং অপরটি শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্য। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৌরের ভোগ পৃথক করিয়া দিতেন। সেদিন প্রাণের আনন্দে বহু উপচারে ভোগের আয়োজন করিয়া তিনি প্রভু নিতাই ও প্রাণগৌরকে ভোগ আরতি দর্শন করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া পরমানন্দে আরতি দর্শন করিলেন। তাহার পর সীতানাথ, মহাপ্রভু ও অবধূত নিতাইকে ভোজনের জন্য আহ্বান করিলেন।

দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই, প্রভু বোলাইল ;
জোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল।
মুকুন্দ বলে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে ;
পাছে মুই প্রসাদ পাইমু তুমি যাহ ঘরে।
হরিদাস বলে মুই পাপিষ্ঠ অধম ;
বাহিরে একমুষ্ঠি পাছে করিমু ভোজন।" চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়

ভোজন সমাপনান্তে শ্রীঅদ্বৈত স্বহস্তে শয্যা রচনা করিয়া প্রভুদ্বয়কে তাহাতে শয়ন করাইলেন।

দুই প্রভু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণকালে আচার্য্যের বহির্বাটিতে আসিয়া দিব্যাসনে উপবেশন করিলেন। শান্তিপুরবাসী সকলে আসিয়া বহিরাঙ্গন পূর্ণ করিল। সকলের মুখেই হরিধ্বনি। প্রভুর অপূর্ব্ব সন্ন্যাসরূপ দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া তাঁহার চরণ কমলে নিপতিত হইতে লাগিল। লোকসঙ্ঘট্ট ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল যোগে সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভু নানা ভঙ্গী করিয়া প্রভুর সম্মুখে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিতাই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া গৌরহরিকে ধরিয়া বেড়াইতেছেন। তখন অদ্বৈতপ্রভু ও ঠাকুর হরিদাস পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৃত্য করিতেছেন।

"নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া।"

চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়

গৌরহরি দশদিন শান্তিপুরে বাস করেন। শচীমাতা ও নবদ্বীপের ভক্তগণও শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। প্রভুর নীলাচল যাত্রার শুভ বিজয় মুহূর্ত্ত আসিলে ভক্তবৃন্দ কান্দিয়া আকুল হইলেন। এমন সময় ঠাকুর হরিদাস তাঁহার স্বাভাবিক দীনতা ও আর্ত্তি সহকারে উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে দৌড়াইয়া আসিয়া দীঘল হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। হরিদাসের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে কাষ্ঠ পাষাণও দ্রব হইতে লাগিল। ভক্তবৃন্দ হরিদাসের দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া কান্দিয়া অস্থির হইলেন; প্রভু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি সজল নয়নে গদগদ কণ্ঠে মৃদুস্বরে কহিলেন—

"এই মত ভাগ্য মোর কত দিনে হবে?
পড়িয়া কান্দিব জগন্নাথের চরণে॥
কহিব কাতর বাণী পদাম্বুজ পাঞা।
সফল করিব আমি শ্রীমুখ দেখিয়া॥

ঠাকুর হরিদাসের গৌর চরণে নিবেদন—

"নীলাচল যাবে তুমি মোর কোন গতি?
নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি।
মুঞি অধম না পাইয়া তোমা দরশন॥
কি মতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন?" চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়

উত্তরে গৌরহরি করুণা সজল নয়নে ও মধুর স্বরে বলিলেন—

"হরিদাস! কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যে মোর ব্যাকুল হয় মন॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥" চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়

এ ভক্ত বাৎসল্য আর কোথাও আছে কি?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নীলাচল বিজয় প্রসঙ্গে

গৌরহরি দক্ষিণদেশ বিজয় করিয়া শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়াছেন—এই শুভ সংবাদ নদীয়ায় পঁহুছিলে সেখানে ভক্তগণ পরম উল্লসিত হইলেন। পরমানন্দে সকলে গৌর-দর্শন মানসে নীলাচল যাত্রার উদযোগ করিতে লাগিলেন। অনেকেই শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর ভবনে আসিয়া মিলিত হইলেন। নবদ্বীপের শ্রীবাস আদি ভক্তগণ, কাঞ্চন পল্লী (কাঁচড়াপাড়া) হইতে সেন শিবানন্দ, কুলীনগ্রাম হইতে গুণরাজ খান ও সত্যরাজ খান, শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ, বাসুদেব দত্ত, শঙ্কর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, সকলেই চলিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর নিকট হরিদাস ঠাকুর ছিলেন। তিনি অদ্বৈতপ্রভুর চরণে করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "এ অধম কি প্রভু দর্শনে যাইতে পারে ?

হরিদাস যবন। যবনের শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনের অধিকার নাই। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "হরিদাস! কোন ভয় নাই। তুমি আমার সঙ্গে চল। তুমি না যাইলে প্রভু দুঃখিত হইবেন। তুমি না যাইলে আমারও যাওয়া হইবে না।

হরিদাস ঠাকুর কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "আমি কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে যাইব না। দূরে থাকিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিব। কারণ আমি নীচ জাতি। আমার স্পর্শে ক্ষেত্রবাসী মহাত্মাদের শরীর অপবিত্র হইবে।"

অদ্বৈতপ্রভু হাসিয়া বলিলেন "সে সকল কথা প্রভু জানেন। তিনি তাঁহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।"

হরিদাস আশ্বাস পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে প্রায় চারিশত নদীয়াবাসী ভক্ত সঙ্গে অদ্বৈতপ্রভু —দুর্গমপথে পদব্রজে—নীলাচল যাত্রা করিলেন। ঠাকুর হরিদাসও সঙ্গে আছেন। এই তাঁহাদের প্রথম নীলাচল যাত্রা। পথে পরমানন্দে গৌরগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা যথাসময়ে শ্রীক্ষেত্রে পঁহুছিলেন।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে পাইয়া গৌরহরি আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। সকলকে পুনঃ পুনঃ প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

"সভারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস ;" চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ

অতঃপর প্রভু চতুর্দ্দিকে প্রেমবিষ্ফারিত নয়নে চাহিতে লাগিলেন। যেন কোন বিশেষ আপনজনকে অনুসন্ধান করিতেছেন। হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া এত আনন্দের মধ্যেও তাঁহার মন উদাসী হইয়া গেল। শ্রীহরিদাস শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ভিতর আসেন নাই। প্রভুর সহিত কি করিয়া মিলিবেন? তিনি দূরপথে রহিয়া প্রভুর শ্রীচরণকমল স্মরণ করিয়া প্রেমানন্দে উচ্চ নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন! প্রভু যখন বিষণ্ণমনে হরিদাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কয়েকজন ভক্ত ছুটিয়া যাইয়া হরিদাসকে বলিলেন—

"প্রভু তোমা মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে" ॥

হরিদাস করযোড়ে নিবেদন করিলেন—

—"মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে যদি স্থান খানি পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ ॥
জগন্নাথের সেবক যাঁহা স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ

ভক্তগণ গৌরহরির নিকট গিয়া হরিদাসের এই দৈন্যভরা কথা বলিলেন। হরিদাসের দৈন্য আর্ত্তির কথা শুনিয়া তিনি মনে আনন্দ পাইলেন; ইহাতে তাঁহার কোমল-হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল। কিন্তু মনের ব্যথা তিনি মনেই রাখিলেন।

গোপীনাথ আচার্য্যকে ডাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিলেন, "তুমি নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে যাইয়া—তাঁহাদের বাসার সুব্যবস্থা কর। বাণীনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি মহাপ্রসাদের বন্দোবস্ত কর"

কাশীমিশ্রকে নিভৃতে প্রভু কহিলেন—

"আমার নিকট এই পুষ্পের উদ্যানে; (১)
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে।
সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন;
নিভৃতে বসিঞা তাঁহা করিব স্মরণ॥" চৈঃ চঃ মঃ ১১শ

কাশীমিশ্র উত্তর করিলেন—

"প্রভু! তোমারই ত সব, তবে আর চাহিয়া লজ্জা দাও কেন? তোমার যে স্থান প্রয়োজন হয় স্ব ইচ্ছায় লও। আমাকে আজ্ঞাকারী-দাস মনে করিয়া যখন যে আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই পালন করিব" —এই কথা বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন। হরিদাসের জন্য প্রভু যে এই নির্জ্জন কুটিরখানি স্থির করিলেন, তাহা তখন কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

"মহাপ্রভু কহে 'শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন॥
সমুদ্র স্নান করি কর চূড়া-দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন॥" চৈঃচঃ মঃ ১১শ

যখন প্রভু একান্ত হইলেন, তিনি হরিদাসের অন্বেষণ পথে বাহির হইলেন। সঙ্গে কেহ নাই, ভক্তবৎসল গৌরহরি একাকী রাজপথে

(১) এক্ষণে ইহা সিদ্ধবকুল মঠ নামে খ্যাত।

চলিয়াছেন। কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন, পথের এক পার্শ্বে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া হরিদাস উচ্চ নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন! প্রভুকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়াই তিনি দণ্ডবৎ হইয়া চরণতলে দীঘল হইয়া পড়িলেন। অমনি দয়াময় প্রভু তাহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। প্রভু ও ভৃত্য দুইজনেই প্রেমাবেশে অধীর হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ের অঙ্গ উভয়ের নয়ন ধারায় সিক্ত হইল। প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার এই অযাচিত কৃপার নিদর্শন পাইয়া হরিদাস প্রেমে আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল গৌরসুন্দর হরিদাসের দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া বিবশ হইয়া প্রেমানন্দে ঝুরিতে লাগিলেন।

"দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে;
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্যগুণে॥" চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ

হরিদাস কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণ ধরিয়া নিবেদন করিলেন—

"প্রভু! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি নীচ জাতি, অস্পৃশ্য নরাধম পামর।"

দয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ গুণমণি পরম প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কলিলেন—

—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে;
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥" চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ

হরিদাস ঠাকুর প্রভুর শ্রীমুখে আত্মস্তুতি শ্রবণ করিয়া মরমে মরিয়া যাইলেন। তিনি দুই কর্ণে হস্তপ্রদান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া করুণাবতার গোরা-শশীর কোমল প্রাণ আকুলিত হইয়া গেল। তিনি হরিদাসকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কাশীমিশ্রের পুষ্পোদ্যানে লইয়া যাইয়া নির্জ্জন স্থানে প্রভু ও ভৃত্য উভয়ে একত্রে বসিলেন। প্রভু হরিদাসকে বলিলেন—

"এই স্থানে রহ—কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥" চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ

হরিদাস প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞাবাণী শ্রবণ করিয়া পুলকিতাঙ্গ হইলেন। আনন্দে অধীর হইয়া প্রভুর সম্মুখে তিনি দুই বাহু তুলিয়া উচ্চ হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহার সহিত নৃত্য-কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। বহুক্ষণ উভয়ে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়া সুস্থির হইয়া বসিলেন।

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরূপ প্রসঙ্গে—ঠাকুর হরিদাস

প্রয়াগ হইতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আদেশ অনুসারে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রথমে বৃন্দাবনে যান। বৃন্দাবন হইতে পুনরায় গৌড়ে যাত্রা করেন। গৌড় হইতে শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন আশায় নীলাচলে গেলেন। তিনি নীলাচলে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে ঠাকুর হরিদাসের কুটিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

".....আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাস বাসস্থলে॥" চৈঃ চঃ অন্ত ১ম

হরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপকে পাইয়া যেন আকাশের চান্দ হাতে পাইলেন। জপের আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন, উভয়ে কান্দিয়া আকুল হইলেন। উভয়ের অঙ্গ উভয়ের নয়নের প্রেমজলে সিঞ্চিত হইল। কিছুক্ষণ পরে সুস্থির হইয়া হরিদাস ঠাকুর অতি দীনভাবে বলিলেন—

"আপনি যে আজই নীলাচলে আসিবেন, প্রভু তাহা আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।"

"হরিদাস ঠাকুর তাঁরে—বহু কৃপা কৈলা;
তুমি যে আসিবে মোরে প্রভুও কহিলা।" চৈঃ চঃ অন্ত ১ম

শ্রীজগন্নাথ দেবের 'উপলভোগ' দর্শন করার পরে গৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন দিতে প্রত্যহ তাঁহার আবাস (সিদ্ধ) বকুল তলে আসেন। এই দিন শ্রীরূপের আগমনের কিছুক্ষণ পরেই গৌরহরি হঠাৎ ঠাকুর হরিদাসের নিকট আসেন। মহাপ্রভুর দর্শন মাত্রেই শ্রীরূপ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রণত শ্রীরূপকে চিনিবার অসুবিধা অনুমান করিয়া—ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুকে বলিলেন প্রভু! শ্রীরূপ তোমাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।"

গৌরসুন্দর হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে কুশল প্রশ্ন অন্তে শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন।

হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা।" চৈঃ চঃ অন্ত ১ম

তাহার পর শ্রীরূপ ও ঠাকুর হরিদাসকে লইয়া গৌরহরি একস্থানে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠির পর হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীরূপ একত্রে এক বাসায় থাকেন। প্রভু প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দেন।

"প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে;
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে।
ইষ্ট গোষ্ঠী দোঁহা সনে করি কতক্ষণ;
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন।" চৈঃ চঃ অন্ত ১ম

হরিদাস ঠাকুরের বাসায় বসিয়া একদিন শ্রীরূপ একখানি নাটক লিখিতেছেন। অদূরে হরিদাস ঠাকুর নাম-মালা জপ করিতেছেন।

আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন।
সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈল;
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা।" চৈঃ চঃ অন্ত ১ম

তারপর মহাপ্রভু শ্রীরূপের প্রতি উদ্দেশ্য করিয়া—মধুর হাসিয়া বলিলেন—

কাঁহা পুথি লিখ? বলি এক পত্র নিল;
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল।
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি;
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি।"—চৈঃ চঃ অন্ত, ১ম

গৌরসুন্দর যে পাতাটী হাতে লইয়া দেখিতেছিলেন,

"সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা;
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা।" চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম

নিম্নলিখিত শ্লোক রত্নটীই ঐ পাতায় লিখিত ছিল।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।

(বিদগ্ধমাধব ১ম অঙ্ক ১৩ শ্লোক)

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন—'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয় যে কিরূপ অমৃতে রচিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কৃষ্ণনামের অদ্ভুত মাধুর্য্যের কথা কথঞ্চিৎ বলিতেছি শুন। নৃত্যকলা-বিশারদা পরমাসুন্দরী নটীর নৃত্য যেমন চিত্তবিনোদন, সমর্থ। এই নাম যখন জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকেন তখন ইহার মাধুর্য্য এতই মনোরম, এতই লোভনীয় যে উহা অত্যধিকরূপে কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে। কারণ, কৃষ্ণ-নামের মাধুর্য্যই এমন অদ্ভুত যে, ইহার আস্বাদন-সময়ে আস্বাদন-তৃষ্ণায় নিবৃত্তি তো হয়ই না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যতই আস্বাদন করিবে ততই—আরও আস্বাদন করিবার জন্য আকাঙ্খা প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। 'কৃষ্ণ-নাম' যখন জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন ইহার এত মাধুর্য্য অনুভূত হয় যে, কেবলই এই নামটী উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয়। এক জিহ্বায় কত উচ্চারণ করিবে? তাই অসংখ্য জিহ্বা পাইবার জন্য লোভ জন্মে। অসংখ্য জিহ্বা যদি হইত তবে বোধহয় এই পরম মধুর নাম-উচ্চারণ করিয়া ইহার মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ উপভোগ করা যাইত। এইরূপই মনে মনে হয়। আবার, নিজের বা অপরের উচ্চারিত কৃষ্ণ-নামের ধ্বনি যদি একবার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন মনে হয় যেন কর্ণে অমৃতধারা-প্রবাহিত হইতেছে। শতগুণে স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। অনন্ত-বিস্তৃত-মাধুর্য্য প্রবাহে, দুই কাণে কত পান করিবে? অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণ পাওয়ার ইচ্ছা হয়। যদি কোটি কোটি

কান থাকিত তাহা হইলে বোধহয় কৃষ্ণনাম শুনার সাধ মিটিত—এই-রূপই মনে হয়। আবার এই নামটি যখন মনের মধ্যে উদিত হয়, তখন অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার যেন লোপ পাইয়া যায়,—চক্ষু তখন আর কিছু দেখিতে পায় না—কর্ণ তখন আর কিছু শুনিতে চায় না—জিহ্বা তখন আর কিছু উচ্চারণ করিতে পারে না চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন নিজ নিজ কার্য্য ত্যাগ করিয়া তখন লোলুপদৃষ্টিতে কেবল চিত্তের দিকেই চাহিয়া থাকে। কৃষ্ণনামের উদয়ে চিত্তে যে অপূর্ব্বে আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য লালসায় সকল ইন্দ্রিয়খ বোধহয় চিত্তরূপে পরিণত হবার আকাঙ্খা করে। এই 'কৃষ্ণনাম' কোনও একটী ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইলেই স্বীয় মাধুর্য্য রসে সকল ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া ফেলে। নদীতে যখন বন্যা আসে, তখন সমস্ত জলা-নালা-বিল যেমন প্লাবনে ভাসিয়া একাকার হইয়া যায় —কোনওটীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যেমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না সেহরূপ চিত্তে যখন নামরসের বন্যা উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার দ্বারা প্লাবিত হইয়া, কোনও ইন্দ্রিয়েরই স্বতন্ত্র ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকে না। এমনি অপরূপ 'কৃষ্ণনামের' মাধুর্য্য।

ঠাকুর হরিদাস এই শ্লোক রত্নটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শুনিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন—

কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্র সাধুমুখে জানি ;
নামের মাধুর্য্যে ঐছে কাঁহা নাহি শুনি'। চৈঃ চঃ অন্ত ১ম

———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নীলাচলে শ্রীসনাতন প্রসঙ্গে—ঠাকুর হরিদাস

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া নীলাচল হইতে পুনরায় যখন গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শ্রীসনাতন গোস্বামীও মথুরা হইতে নীলাচলে আসিলেন। পথে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কারণ, শ্রীরূপ গৌড়ের দিকে গিয়াছেন, আর শ্রীসনাতন কাশী হইতে ঝারিখণ্ডের পথে নীলাচলে আসিয়াছেন।

হরিদাস ঠাকুর কোথায় থাকেন তাহা শ্রীসনাতন জানিতেন না; তাই লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের বাসায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। সনাতন তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন জানিতে পারিয়া হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

মহাপ্রভুর চরণ দর্শন জন্য সনাতনের মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন যে ব্যস্ততার হেতু নাই; প্রভু এখনই তাঁহার বাসায় পদার্পণ করিবেন।

প্রভু আসিলেন। সনাতনকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন, কুশল প্রশ্নাদি আলাপের পর গৌরহরি বলিলেন, "সনাতন"! তুমি এখানে আসিয়াছ ভালই হইয়াছে। হরিদাসের সহিত এই বাসায় তুমি একত্রে থাক। হরিদাসের মহিমা কীর্তন করিয়া প্রভু বলিলেন—

"কৃষ্ণভক্তি রসে তিঁহ পরম প্রধান।
'কৃষ্ণরস' আস্বাদন কর লও কৃষ্ণ-নাম॥" চৈঃ চঃ অন্ত ৪র্থ

সনাতন গোস্বামী যে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াই নীলাচলে আসিয়াছেন অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানেন। একদিন প্রভু হরিদাস ঠাকুরের বাসায় আসিয়া হঠাৎ শ্রীসনাতনের প্রতি সকরুণ কটাক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

'সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে;
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে।
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে;
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নাহি ভক্তি বিনে।
দেহত্যাগাদি এই সব তামস ধর্ম্ম;
তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম।
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়;
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়।
দেহত্যাগাদি তমো ধর্ম্ম—পাতক-কারণ;
সাধক পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ।
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে;
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেও না পায় মরিতে।
গাঢ় অনুরাগে বিয়োগ না যায় সহন;
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ।
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম ধন।" চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

মহাপ্রভুর কথা এখনো শেষ হয় নাই। তিনি শ্রীসনাতনকে 'কৃষ্ণভজন' করিতে বলিলেন। কলিকালে শ্রেষ্ঠ ভজন কি? কিরূপ ভক্তি যাজন করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, তাহাও বিস্তারিত বলিলেন।

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ— নববিধা ভক্তি;
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণদিতে ধরে মহাশক্তি।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নাম-সঙ্কীর্ত্তন;
নিরপরাধ নাম হৈলে পায় প্রেমধন।" চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯র্থ

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন আমার মনের কথা কিরূপে জানিলেন?

"এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার"—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

শ্রীসনাতন পরম-করুণ গৌরসুন্দরের শ্রীচরণ ধারণ পূর্ব্বক সজল নয়নে বলিতেছেন—

"প্রভু! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তাই আমার মনের সঙ্কল্প তোমার নিকট প্রকাশ না করাতেও জানিতে পারিয়াছ। তুমি কৃপালু, তাই আমার প্রতি কৃপা করিয়া, কিসে আমার মঙ্গল হইবে, তাহা উপদেশ করিলে। তুমি ঈশ্বর, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ। তুমি স্বতন্ত্র, কাহারও অধীন নহ, কাহারও অপেক্ষা রাখ না। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিতে সমর্থ নহি। আমি মরি, ইহা তোমার ইচ্ছা নয়।

নীচ অধম মুঞি পামর স্বভাব ;
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হইবে লাভ ? চৈঃ চঃ অন্ত ৪র্থ

শ্রীসনাতনের মুখের শেষ কথাটি (মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হইবে লাভ ?) মহাপ্রভুর বক্ষে শেল সম বিন্ধিল। তিনি পরম গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার কমল নয়নদ্বয় ছল ছল হইল। তিনি গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন—

"তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন,
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন।" চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

গৌরসুন্দর শ্রীসনাতনের দেহ দ্বারা কি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবেন এখন তাহাই বলিতেছেন—

"ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার ;
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা, প্রবর্ত্তন ;
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ।" চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

গৌরের হৃদয়ের গূঢ় উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া শ্রীসনাতন বিস্মিত, অনুতপ্ত, মুগ্ধ। তিনি বলিলেন—

"—তোমাকে নমস্কারে ;
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ?

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ;
আপনে না জানে পুতলী—কিবা নাচে গায়।
তৈছে যারে যৈছে নাচাও, সে করে নর্ত্তনে ;
কৈছে নাচে, কেবা নাচায় সেহ নাহি জানে।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

মহাপ্রভু হরিদাসকে বলিলেন,—"হরিদাস, তুমি সনাতনকে নিষেধ করিও তাহার নিকট আমার যে বস্তুটি গচ্ছিত আছে, তাহা (সনাতনের দেহ) যেন নষ্ট না করে।

কপট সন্ন্যাসী গৌরহরির কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন,—"আমি সব কাজ করি" আমাদের এই অভিমান সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন দ্বারে ;
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে।
এতাদৃশ তুমি ইহাঁরে করিয়াছ অঙ্গীকার ;
এ সৌভাগ্য ইহাঁর না হয় কাহার॥" চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

প্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ মধুর হাসিলেন। তিনি আর কিছু না বলিয়া—আসন হইতে উঠিলেন এবং শ্রীসনাতন ও হরিদাস ঠাকুরকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। তাঁহার পর মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিতে গমন করিলেন।

হরিদাস ঠাকুর তখন শ্রীসনাতনকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া মধুর ভাষে বলিলেন—

"তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
তোমার দেহ প্রভু কহে "মোর নিজ ধন ;"
তোমা সব ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন।
নিজ দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে ;
সে কার্য করাইবেন তোমায় সেহ মথুরাতে।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

তারপর ভক্তির স্বভাবে নিজ অযোগ্যতা দৃষ্টে আরও বলিলেন—

"আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল ;
ভারত ভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

হরিদাস ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া শ্রীসনাতন বলিলেন—"হরিদাস, মহাপ্রভুর গণের মধ্যে তোমার মত ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই, তোমার জন্মই সার্থক। পরোপকার বা প্রভুর কার্য্য তোমার যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অপর কাহারও দ্বারা হওয়ার নয়। প্রভুর লীলা প্রকটের একটি উদ্দেশ্য শ্রীহরিনাম প্রচার, নামকীর্ত্তন এবং নাম মাহাত্ম্য প্রচারের দ্বারাই ইহা সম্ভব। তোমার দ্বারাই প্রভুর এই প্রধান কার্যটি সুসম্পন্ন হইতেছে। তুমি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তন কর ; আবার সকলের নিকট নামের মাহাত্ম্য প্রচার কর। তুমি যখন উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর, তখন যাহারা তোমার মুখে নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করে, তাওারাই কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাদেরই সংসারের বীজ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় হইয়া যায়। এইভাবে মানুষের কথাতো দূরে, বৃক্ষ-লতাদি স্থাবর প্রাণী—এবং পশুপক্ষী আদি জঙ্গম উদ্ধার হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা পরোপকার আর কি হইতে পারে ? আর নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তুমি কত লোককে যে ভগবদ্‌চরণে উন্মুখ করিয়াছ এবং করিতেছ তাহারও ইয়ত্তা নাই। সুতরাং তোমা দ্বারাই জীবের বাস্তবিক উপকার হইতেছে।

হরিদাস ঠাকুর আত্মপ্রশংসা শুনিতে না পারিয়া কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিলেন। শ্রীসনাতনের বদনে হস্ত দিয়া বলিলেন "সনাতন ! চুপ কর এমন কথা মুখে আনিতে নাই। মুঞি বড় অধম নীচ। সর্ব্বগুণনিধি পরমদয়াল মহাপ্রভু গুণ গাও। এস দুইজনে মিলিয়া গৌর কীর্ত্তন করি। এই বলিয়া দুইজনে কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন—

"ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ॥"

———

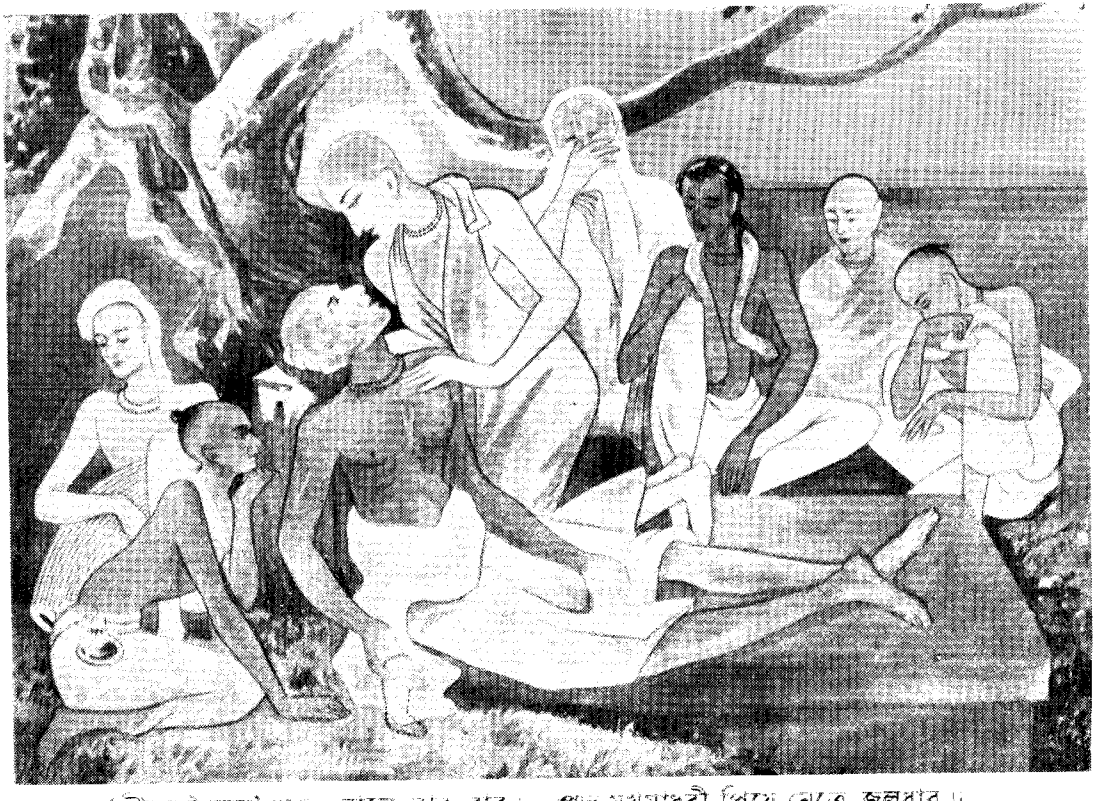

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ বোলে বার বার। প্রভু মুখমাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ। নামের সহিত প্রাণ কৈলা উৎক্রমণ ॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ লীলা

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনের সারাংশ)

শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীহরিদাস নির্যাণ তিথিতে শ্রীধাম নীলাচলে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠ থেকে বার হয়ে গম্ভীরায়, সিদ্ধ-বকুলতলায়, জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে ও সমুদ্রতীরে সমাধিস্থলে বসে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত ঠাকুর হরিদাসের নির্যাণ লীলার অনুকীর্ত্তনে শ্রীগুরু স্মরণে যে ভোগময় ও ভাবময় স্বকৃত অমিয় আঁখরে নির্যাণ লীলাটি পরিবেশন করেছেন সেটি সহজ সরল অন্বয়মুখে তাঁরই কৃপায় প্রকাশ করার প্রয়াস মাত্র আমার। সুধীজন শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের ভাবময় ভোগটি তাঁদের কৃপাময় অন্তর্দৃষ্টিতে গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবো।

প্রথমেই তিনি সপরিকর পরমকৃপালু শ্রীচৈতন্যদেবের জয় দিয়ে আরম্ভ করেন—জয় প্রেমাবতার ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী গৌরহরি, তোমার ভক্তবৎসল লীলার জয় হোক্। শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তন বিলাস রঙ্গে দিবা ভাগে নৃত্য কীর্ত্তন, ঈশ্বর জগন্নাথ দর্শন ও রাত্রে পূর্ব্বলীলা সহচরী বিশাখাও ললিতা রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর সঙ্গে নিভৃত গম্ভীরায় রস আস্বাদন করেন। তাঁরা সরম সখী ভাবনিধি গোরার ভাব বুঝে বিরহিনী শুদ্ধ রাধার সেবা করেন। কারণ এবার তিনি সেই ব্রজের শুদ্ধ রাধাভার আস্বাদ করতে এসেছেন, সেই ভাবানুকূল প্রসঙ্গে শ্রীমুখ দেখে বুক জেনে অনুকূল কথা প্রসঙ্গে উভয়েই সেবা তন্ময়। একদিন নিত্যসেবায় মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ প্রভুর আজ্ঞায় ঠাকুর হরিদাসকে মহাপ্রসাদ দিতে এসে দেখেন তিনি সিদ্ধবকুল তলে শুয়ে মৃদু মৃদু মহামন্ত্র সংখ্যা সংকীর্ত্তন করছেন। এই সেই সিদ্ধ বকুল যা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোবৃত্তিরূপ, প্রাণের হরিদাসকে

রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা করে সেবা করতে জগন্নাথের প্রসাদী বকুল বৃক্ষের দাঁতন থেকে ভক্তবাৎসল্যের নিদর্শনরূপ আপন প্রকাশ। গোবিন্দ প্রসাদ ভোজনের আহ্বান জানালে ঠাকুর হরিদাস বল্লেন—আমার সংখ্যা সংকীর্ত্তন পূরণ হয়নি কেমতে খাইব। মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমতে উপেক্ষিব। তাই তার সমাধানে তিনি মহাপ্রসাদ বন্দনা করে এক রঞ্চ নিয়ে করিল গ্রহণ।

সেবক গোবিন্দের মুখে তাঁর হরিদাসের খবর শুনে মহাপ্রভু পরদিন নিত্যকার মত জগন্নাথের মঙ্গল আরতি দর্শন শেষে তাঁকে দেখা দিতে এসেছেন, দীনতার মূরতি হরিদাস নিজেকে অদৃশ্য অস্পৃশ্য বোধে শ্রীমন্দিরে যান না। দূর হতে শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করেন মাত্র, পাছে তাঁর দর্শনে সেবকগণ অপবিত্র হন, নিজে অপরাধী হবেন। এই স্বভাবে গম্ভীরা নিকটে নির্জনে প্রাণ গৌরকে বুকে ধরে আপন ভজন মহামন্ত্র সাধন করেন। অচল আর সকল দুই স্বরূপের খেলা লীলাচলে যুগপৎ চলে। সচল বিগ্রহ গৌরহরি নাম প্রেম দানকারী আর অচল দারুমূর্ত্তি জগন্নাথ অধরামৃত মহাপ্রসাদ বিতরণকারী। প্রভু ভক্তবাৎসল্য রসের বশে হরিদাসকে নিত্য দেখতে বা দেখা দিতে আসেন। নিগূঢ় গৌরাঙ্গ লীলা তাইতে বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনে বলেছেন—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় এ রহস্য সমাধান হয়। মহাভোগ আস্বাদনের অবতার গৌরহরি। ভাব নিধির ভাব অপার। তাই লীলা রহস্য বোঝা ভার। ভোগময়ী লীলায় গৌরহরি প্রাণের হরিদাসকে দেখতেই আসেন। এই লীলায় অন্তর ও বাহ্য দুই লীলা। অন্তরে রস আস্বাদন বাইরে জীব উদ্ধারণ। ভোগের আকর্ষণে গৌরের হরিদাসকে দেখতেই আসা, আনুসঙ্গে দেখা দেওয়া। এবার তাঁর ভোগময় অবতার—মহাভোগী সে—আপন ভেগে সদা মেতে থাকে। রাধার মঙ্গল আরতিকালে গৌর জগন্নাথ দর্শন করেন। জগন্নাথ তখন নিকুঞ্জ বিলাসময় চিহ্নে নাগরেন্দ্রমণি স্বরূপে সজ্জিত—যা দেখে গৌর কিশোরী

তাঁর প্রাণনাথ শ্যাম সুন্দরের দর্শনে মুগ্ধ হন। মনের সম্ভোগময় তৃপ্তি নিজের সর্ব্বাঙ্গে ফুটে ওঠে। বুকের ভোগ শ্রীমুখে বেশী ফোটে। এই ভোগময় স্বরূপ নিয়েই প্রাণের হরিদাসকে দেখতে ছুটে আসেন সামনে এসে দাঁড়ান ও দর্শন করেন। হরিদাস—স্বচ্ছ দর্পণ। তাইতো নিজ ভোগ মাধুরী প্রতিফলিত। গৌর কিশোরীর প্রাণে আরও নূতন বাসনা জাগে। প্রাণের হরিদাস হতে সাধ হয়। হরিদাস হলে স্বমাধুরী আস্বাদন হয় না স্বীয় স্বরূপে সম্ভব নয়। এইভাবেই পরিণতি লীলায় ভাবনিধির ভোগের অবধি বাড়ে। করিবাজ গোস্বামীর ভাষায়—'ভোগের অবধি নাই।'

গৌরের আগের দিনের ঘটনা মনে পড়ে। তাই তিনি ঠাকুর হরিদাসের কাছে এসে বলেন—সিদ্ধদেহে সাধনে এত আগ্রহ কেন? নামের সংখ্যা অল্প করলে সবদিকেরই সমাধান হয়। নামের মহিমা তো প্রচার হয়েছে। হরিদাসের মহিমা তিনি স্মরণ করেন। কাজীর বিচারে মুসলমান হয়ে হিন্দুর 'হরিনাম' উচ্চারণের অপরাধে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত বরণ করে নিয়ে আপ্রাণ হরিনাম গ্রহণের সঙ্কল্প, নাম প্রভাবে হীরাবেশ্যা উদ্ধার, বিষধর অজগরের পলায়ন, নিরবধি দৈন্য যাজন, অটুট সঙ্কল্পে আজীবন সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন সম্পুরণ সবই স্মরণ করেন প্রভু। সর্ব্বোত্তম হয়েও নিজেকে হীন মানার দৈন্য একমাত্র গৌরগণেই দর্শনীয়। হরিদাসের দৈন্য-ভূষণ তায় অপতিত সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন যাতে প্রাণ গৌরের হয় আকর্ষণ। গৌরের কথায় হরিদাস নিজের সৌভাগ্য ও বাসনা জানাতে থাকেন—অনেক নাচিয়েছেন তিনি তাঁর খেলার পুতুল করে। তাঁর কৃপা প্রসাদে ম্লেচ্ছ হয়েও অদ্বৈত প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধের অর্থীভাগ ভোজন করেছেন। প্রভুদত্ত প্রসাদেরও অধিকারী হয়েছেন। আর কিছু সাধ নেই কেবল এক সাধ তিনি শ্রীঅদ্বৈতের তর্জ্জায় জেনেছেন অচিরে প্রভু লীলা সংবরণ করবেন, সে লীলা দেখার আগে তিনি তাঁর দেহ রাখতে চান না এই বাসনা তাঁর। তিনি গৌর বিরহ জ্বালা ভোগ

করতে চান না—শুধু এই প্রার্থনা—হৃদয়ে প্রভুর কমল চরণ ধরে নয়নে চাঁদ বদন হেরে জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণ করে যাঁর প্রাণ তাঁকে দান করেন। ইচ্ছাটুকু প্রভুর চরণে জানিয়ে তিনি কৃপার অপেক্ষা করেন। হরিদাসের বাসনা শুনে মহাপ্রভু বলেন—হরিদাস ! তুমি যে কিছু মাগিবে, কৃপাময় কৃষ্ণ অবশ্যই পূরণ করবেন। কিন্তু আমার যা কিছু মুখ সব তোমা নিয়ে। কৃষ্ণ বিরহ জ্বালা জুড়ানোর মহৌষধ একমাত্র মিলন প্রসঙ্গ। এই মিলন সুখ প্রসঙ্গ হরিদাস কৃত মহামন্ত্র নাম সংকীর্ত্তনে প্রভুর উপলব্ধি হয়; কারণ শ্রীমতীর দশমী দশায় সখীরা কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র নিরন্তর কানে শুনিয়েছিল তাতে শ্রীমতী প্রাণে বেঁচেছিলেন। সেই নিকুঞ্জ লীলা রহস্যময়—ভোগ গৌর কিশোরী ভোগ করেন হরিদাসের নিরন্তর নাম সংকীর্ত্তনে। হরিদাসই প্রভুর এই ভোগ সুখ দাতা। গৌরের এই কথা। হরিদাসকে ছাড়তে তাই তাঁর বুকে এতো ব্যথা।

তখন চরণ দুটী বুকে ধরে মায়াজয়ী হরিদাস প্রভুকে মায়া করতে নিষেধ করেন। প্রভুর দয়া অবশ্যই পাবেন। এই প্রত্যাশায় হরিদাস বলেন—তাঁর লীলার সহায় কত কত মহাশয় কত ভক্ত হয়,—তাঁর মত ক্ষুদ্র এক পিপীলিকার মরণে পৃথিবীর কি হানি হয় ? হরিদাসের দৈন্যে বিহ্বল প্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন দানে মধ্যাহ্ন করতে যান। পরদিন সকালে যথারীতি জগন্নাথ দর্শন করে সপরিকরে হরিদাসের বাসনা পূরণ করতে সেই সিদ্ধবকুল তলায় আসেন। প্রভুর দর্শন পেয়ে হরিদাস সবার চরণ বন্দনা করলেন। আজ প্রভু ভক্ত হরিদাসের বাসনা পূরণ করবেন তাই শ্রীঅঙ্গনে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। ত্রিকাল সত্য লীলায় সিদ্ধ বকুল তলায় প্রভু আজও নাচছেন ভাগ্যবান জন দেখছেন। মহাসংকীর্ত্তনে ভক্তদের সামনে প্রভু পঞ্চমুখে হরিদাসের মহিমা গাইছেন। প্রভু আজ যেন পঞ্চানন, পঞ্চ মুখে করেন কীর্ত্তন—ভক্ত বাৎসল্যের নিদর্শন। বিস্ময় মগ্ন ভক্তগণ হরিদাসের করেন চরণ বন্দন। নিজ বাসনা পূরণের শুভক্ষণ বুঝে

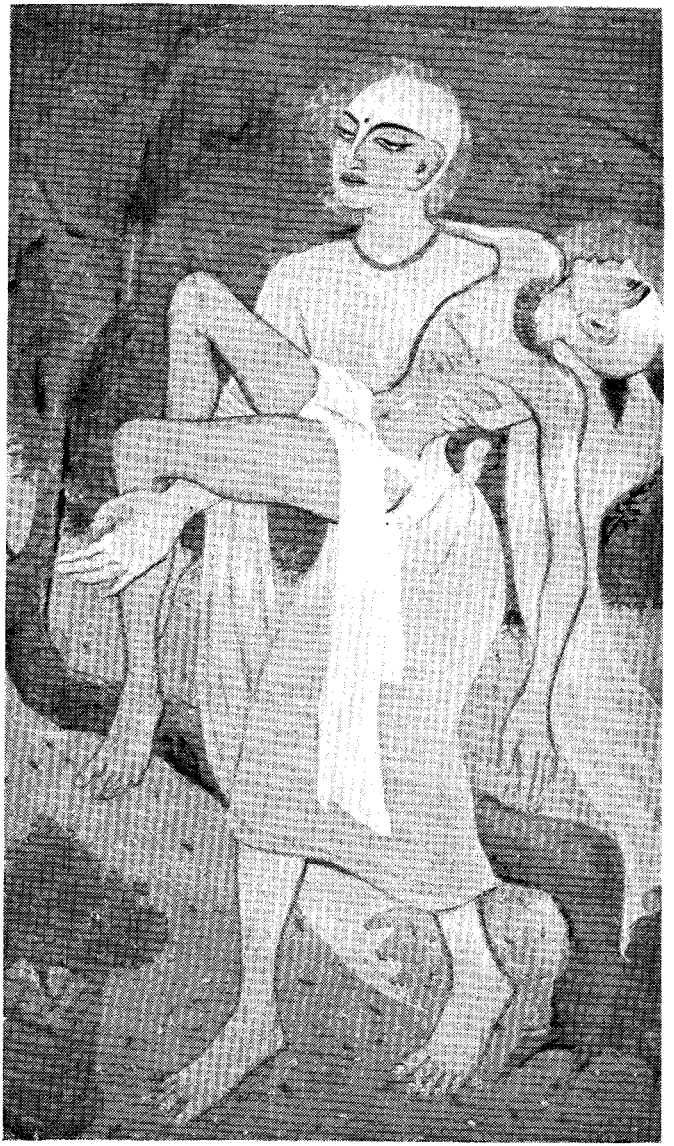

হরিদাসের তনু (প্রভু) কোলে লৈল উঠাইয়া।
অঙ্গণে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

পরম স্নেহে প্রভুকে সামনে বসান। হরিবোলা রসের বদন পানে নয়ন দুটি অর্পণ করে চরণ দুটি বুকে ধারণ করেন। প্রাণ ভরে মুখ মদ্ম মধু নয়ন ভৃঙ্গ দ্বারে আকণ্ঠ পানে মত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণের সঙ্গে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম সেই নামীকে নিজ প্রাণ দান করলেন। হরিদাসের বাসনা পূরণ হলো। আজীবন 'হরেকৃষ্ণ' বহামন্ত্র সাধন ঘলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রাণ গেল চলে—ইহাই গৌরগণের চরম প্রাপ্তি। তাই এ শুধু হরিদাসের নির্যান নয়, সাধ্য সাধন তত্ত্বেরও সুনির্ণয়।

মহাযোগেশ্বর প্রায় হরিদাসের প্রয়াণ ভীষ্মের ইচ্ছা মরণ স্মরণ করায়। শরশয্যায় শয়নে থেকে উত্তরায়ণে ইচ্ছামরণ শুধু নয় যুধিষ্ঠিরাদি ভক্তবর্য্য সম্মুখে কৃষ্ণকে সামনে রেখে ইচ্ছামরণ বরণই এর তাৎপর্য্য। ভক্ত বিরহ দুঃখে সবাই শ্রীহরি স্মরণ করেন। প্রেমানন্দে প্রভু বিহ্বল হন। হরিদাস ছেড়ে গেলো প্রভুর আনন্দ হলো এ বড় অনুভবের কথা। প্রভুর উল্লাস এ বড় বিরুদ্ধাভাষ। এর সমাধান—নিজ অপূর্ণ সাধ সম্পূরণ। প্রকটে হরিদাসকে বুকে ধরতে প্রভুর বড় সাধ ছিল। হরিদাসের দৈন্যে সে সাধ অপূর্ণ ছিল—আজ প্রাণের হরিদাসের স্থির চিন্ময় দেহ বুকে ধরে প্রভুর সে সাধ মিটলো। ভক্তবাৎসল্য লীলার জয় ঘোষিত হলো। প্রভু হরিদাসের অপ্রাকৃত দেহ বুকে নিয়ে নৃত্য করলেন—ঠিক যেমন সতী দেহ কাঁধে নিয়ে শঙ্কর নেচেছিলেন! এ হরিদাসের নির্যাণ লীলা শুধু নয় পরম ভোগময় নিগুঢ় অভিনয়। এই নির্য্যাণ লীলায় প্রভুর নাম মহিমা প্রচার-ব্রতের উৎরাপন হল। হরিদাসের ও আর এক গূঢ় বাসনা ছিল নিতাই এর সেবা করবে। গৌরের সন্ন্যাস আবরণ নিতাই এর। অনঙ্গ মঞ্জরী ভাবে গৌর কিশোরীর বুকের আবরণ নিতাই। তাই আজ নিতাই গৌর মিলিত তনুর আবরণ হলেন হরিদাস। এরপর সপরিকর গৌর সমুদ্রজলে হরিদাসের দেহ স্নান করালেন। হরিদাসের পাদস্পর্শে সমুদ্র আজ মহাতীর্থ হল। সমাধি রচনা করে আপন হাতে প্রভু বালু

দিলেন। "ভক্তবাৎসল্যের অবধি ঠাকুর হরিদাসের সমাধি"। স্বয়ং প্রভু জগন্নাথের সিংহদ্বারে পশারির কাছে আঁচ পেতে ভিক্ষা করে নিজে হরিদাসের মহোৎসব করলেন। আজ বিশ্বম্ভর ভিক্ষারী প্রভু হয়ে হরিদাসের সেবক হলেন। ভিক্ষান্ন প্রসাদে সপরিকরে আপন হাতে পরিতৃপ্ত করে বরদান করলেন।

প্রেমাবিষ্ট হঞাপ্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন প্রাণ॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যেই তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যেই তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন॥
অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥

ভক্তবাৎসল্য লীলার জয় ঘোষণা হল। নীলাচলময় ভূরিদাতাপ্রভুর জয় ঘোষিত হল। নাম মহিমা প্রচারকারী দৈন্যাবতার হরিদাস ঠাকুরের জয় গানে নীলাচল ধাম মুখরিত হলো। পদকর্ত্তার অনুকীর্ত্তনে ভক্তগণের সাথে শ্রীল বাবাজী মহারাজ হরিদাস নির্য্যাণ লীলায় প্রভুর বিরহ ভাবকে ব্যক্ত করে গেয়ে ওঠেন,

হরিদাস ছেড়ে গেল প্রাণে বাঁচা ভার।
দিনে রেতে নাম শোনাত তিন লক্ষ বার।

———

হরিদাসের প্রেমে বাঁধা পড়ি, বিশ্বম্ভর ভিখারী।

সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥
'হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে' ভিক্ষা দেহত আমারে॥

বিংশ পরিচ্ছেদ

"ঠাকুর হরিদাস" মঠের ইতিহাস

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীহস্তে ঠাকুর হরিদাসকে সমাধিস্থ করিয়া যে অসমোর্দ্ধ ভক্তবাৎসল্যের নিদর্শনরূপে 'সমাধি-পীঠ' নির্মাণ করিয়াছিলেন—সেই শ্রীনীলাচলে—সেই নীলাম্বুধির কূলে সেই সমাধি পীঠটি অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহার বর্তমান নাম "**শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ**"।

'স্বর্গদ্বার' নামক বেলাভূমির বিস্তৃত স্থানটি প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই শ্মশানভূমিরূপে পরিণত হইয়া আছে।

শ্রীগৌরহরির প্রকট বিহারের সঙ্গী স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, দাস গোসাঞি (রঘুনাথ দাস) প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ এই স্বর্গদ্বারে অবস্থিত 'সাতাসন মঠে' বাস করিয়া ভজন করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্তপ্রদত্ত হরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠের সংস্পর্শলাভের জন্যেই আজও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই পরম পবিত্র এই শ্মশান ভূমিতেই ভজন করিয়া আসিতেছেন।

দ্বিতীয় কথা শ্রীকাশী মিশ্রালয়টি বর্তমান 'রাধাকান্ত মঠ', এই মঠের মধ্যেই নীলাচলবিহারী গৌরহরির আবাসস্থল "গম্ভীরা" অবস্থিত। আর বর্তমান 'সিদ্ধ বকুল মঠ' তৎকালে কাশীমিশ্রের টোটা বা বাগান ছিল। সুতরাং রাধাকান্ত মঠের অধীন সিদ্ধবকুল এবং স্বর্গদ্বারে অবস্থিত ঠাকুর হরিদাসের সমাধিভূমিটি একদিন সিদ্ধ বকুল মঠের অধীন ছিল।

রাধাকান্ত মঠের দলিলপত্র হইতে সিদ্ধ বকুল মঠের গুরু পরম্পরা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। 'বকুল মঠ' কাশী মিশ্রের উদ্যান ছিল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এইস্থানে প্রকটলীলা সম্বরণ করিলে পর এইস্থান সিদ্ধবকুল নামে খ্যাত হয়।

শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য গোপালগুরু। তাঁহার শিষ্য পরম্পরায় যে কয়জন—তাহাদের মধ্যে শ্রীধ্যানচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়; তাঁহার শিষ্য শ্রীবল ভদ্র। এই বলভদ্রের দুই শিষ্য—(১) শ্রীদয়ানিধি, (২) শ্রীভগবান দাস।

শ্রীদয়ানিধি রাধাকান্ত মঠের এবং শ্রীভগবানদাস সিদ্ধ বকুল মঠের সেবার ভার প্রাপ্ত হন। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বকুল মঠ রাধাকান্ত মঠেরই অন্যতম শাখা

ছিল। অন্য কোন পৃথক সংস্থার অধীনে ছিল না। বলভদ্রের পরই ইহা ঘটে।

শ্মশান ভূমির সেই সমাধি পীঠের প্রথম খ্যাতি ছিল 'ভজন কুঠি' নামে। কালক্রমে এই সমাধি পীঠটি টোটা গোপীনাথের সেবক মামু গোস্বামীর অধস্তন বংশধরদের হাতে আসে।

৺শ্রীল হরিদাস দাস কৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান হইতে জানা যায়, কেন্দ্র পাড়ানিবাসী জনৈক 'ভ্রমরবর' এই সমাধি পীঠে নিতাই, গৌর, সীতানাথ এই তিনটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সহায়তা করেন। এই সময় এইস্থানের নাম ছিল 'গৌরাঙ্গ বাটী'। 'মহাপ্রভুর বাটী' নামেও খ্যাতিলাভ করে।

এই মঠের বিগ্রহ তিনটির অবস্থান ব্যঞ্জনা বিশেষ ধরণের। তিনটি মূর্ত্তিই উপাস্য হইলেও এখানে তাঁহাদের অবস্থান সাধক বা উপাসকের ভঙ্গীতে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন মন্দিরেই ঈশ্বররূপের বিগ্রহকে 'ভক্তের ভঙ্গিমায়' রাখা হয় না। তাই ইহা একমাত্র সিদ্ধ সাধকের অনুভূতি বেদ্য বলিয়াই খ্যাত। এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের অনুভবের বাণী—'ঠাকুর হরিদাস মঠের নিতাই, গৌর, সীতানাথ অদ্ভুত বিগ্রহ। শ্রীবিগ্রহ তিনটিই ভক্ত কক্ষায় নাম জপ করছেন, এখানে ঈশ্বর নন, সকলে সাধক। এদের 'ঈশ্বর' 'ভগবান' 'ঠাকুর' বলে ডাকলে তাঁদের আবেশের সঙ্গে তোমার ডাক মিলবে না। তাঁরা উত্তর দেবেন কোথায় বসে? এখানে যে সেবকের আসনে আছেন। 'গৌর আছেন শ্রীরাধার আবেশে শ্রীকৃষ্ণনামের আস্বাদনে। নিতাই ও সীতানাথ আছেন 'গোরা' নামের জপে।

(শ্রীগুরু কথা প্রসঙ্গ)

এই মঠ কালক্রমে শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের হস্তে যেরূপে আসে তাঁহার বিবরণ নীচে দেওয়া গেল—

কুঞ্জবিহারী দাস গোস্বামী ১৯০৭ সালের ২৯শে অক্টোবর রেজেষ্ট্রী কোবলা দ্বারা এই সেবা শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের নামে হস্তান্তর করেন।

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় ১৯৪৯ সালে এই মঠের জন্য একটি Deed of Trust নির্ম্মাণ করেন। এই ট্রাষ্টের নাম হয় শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর ট্রাষ্ট, স্বর্গদ্বার, পুরী।

তাঁহার প্রকটকালে তিনিই একক ট্রাষ্টি থাকেন। তাঁহার অপ্রকটে ঐ দলিল বলে তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব শ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের ত্যাগী শিষ্য পরম্পরা

পাঁচজন ট্রাষ্টি হইবেন। বর্ত্তমান ট্রাষ্টি—(১) শ্রীকানাই দাস বাবাজী (২) নিতাই দাস বাবাজী (৩) শ্রীমহাপ্রভু দাস বাবাজী (৪) শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী। (৫) শ্রীব্রজগোপাল দাস বাবাজী।

মঠটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত কালের বিবর্ত্তনে, রাজাপ্রজার সম্বন্ধে-সংঘর্ষে, সাধু-অসাধুর গতায়াত ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে এবং লিখিত অলিখিত বহু কাহিনীকে ও ইতিবৃত্তকে অতিক্রম করে, পরে বিংশ শতাব্দীর (১৯০৭) প্রথম দশকে শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের হস্তে ইহার সেবা-স্বত্ব অর্পিত হয়। বড় বিচিত্র ও অতি লৌকিক ধরণেই এই মঠের পুনর্বিকাশ ঘটে এবং ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক ভূমিটির যথাযথ পরিচয় জনসাধারণের গোচরীভূত হয়। যাহা একদিন স্তব্ধ ও সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল তাহাই বোধ হয় "তীর্থভূতানি তীর্থানি" হইলেন। হঠাৎ মহাপুরুষের হস্ত অবলম্বন করিয়াই লুপ্তপ্রায় তীর্থভূমিটি পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত তীর্থরূপে পরিচিত হয়। ইহা শ্রীভগবানের করুণাময়ী ইচ্ছাশক্তিরই ক্রিয়া। ভক্তির প্রাধান্য দিয়াই শ্রীভগবান স্বমহিমাকে প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়া থাকেন।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠও ভক্তাধীন ভগবানের মতই শ্রীপাদ শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের সেবা বন্ধনে ধরা দিয়াছেন।

সাধারণ জমি কেনা-বেচার ঘটনা ইহার বাহ্যরূপ। আন্তররূপ পৃথক। আমরা শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখোক্তি বাণী হইতে সংক্ষেপে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

পুরীধামের গোস্বামী-বংশের অধস্তন সন্তান শ্রীপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামী। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে মঠের স্বত্ব স্বামিত্ব ও তৎসংলগ্ন জমিগুলি গোস্বামী প্রভুর অর্পিত ছিল। তাঁহারই পরবর্তী সময়ে এই মঠের ইতিহাস ভিন্নরূপ ধারণ করে। গোস্বামী মহাশয়ের দুই জামাতার মধ্যে কনিষ্ঠ কুঞ্জলাল গোস্বামীজী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপরই হরিদাস ঠাকুরের মঠ ও ছোট গোপীনাথের সেবা ও স্বামিত্ব নষ্ট হয়।

কিন্তু তাঁহাদের সময়েই মঠের সংলগ্ন জমিগুলির কতক খাজনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। সেগুলিকে আর ফিরাইয়া আনা আর সম্ভব ছিল না ভ্রাতৃযুগলের। জ্যেষ্ঠ এরূপ সরিয়াই দাঁড়াইলেন। কুঞ্জলাল গোস্বামীই ঋণজর্জরিত হইয়া কোনও

প্রকারে মঠের সেবা চালাইতে থাকেন। তাহাও ক্রমে অচল অবস্থায় আসিয়া পড়িল।

আমাদের পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব পুরীর বড় বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীরাধা-রমণ চরণ দাস দেব পরম বৈরাগী হইয়াও তাঁহার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ৺হরিবল্লভ বসুর দ্বারা মঠের সামান্যতম সেবা সাহায্য দিয়া মঠের সেবার আনুকূল্য করিতে থাকেন। যেন করুণাকিঙ্করের সামান্য সেবাই সেদিন মহৎ সেবার দ্বার হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

সেই সেবাকালটিই মহান্ হইয়া দেখা দিবার জন্য সেই ক্ষুদ্র পরিসরের ক্ষেত্রটিতে নানা বিপত্তি দ্রুত ঘটাইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ের পারিবারিক জীবনের সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি ভূমিটি জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। গোস্বামীগণের সেবাবাহু হইতে সরিয়া আসিয়া এইবার যেন বৈরাগীর হাতেই সেবা গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিলেন। কিন্তু সে জাগরণ ঘটিল একান্ত নীরবতার সহিত।

অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও হরিদাস ঠাকুরের মঠটি গোস্বামী জামাতার প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাইবার নিকেতন ছিল এবং তৎসংলগ্ন জমিগুলিও বিক্রয় হইতে হইতে বাকি রহিল শুধু মঠটি। তাহাও ক্রমে ঋণের জিম্মাদার হইল।

এদিকে শ্রীরাধারমণের—আশ্রয়ে যখন কত গৃহী কত বৈরাগী বর্ত্তমানে অবস্থান করিতেছেন, কত বৈরাগী লোকান্তরের দিব্যধামে চলিয়া যাইতেছেন, আবার কত বা ধনী গৃহী তাঁহার করুণা দৃষ্টিতে আবদ্ধ হইয়া উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ভাবেন শ্রীগুরুদেব যদি কোনও প্রকারে বলেন অমুক ক্ষেত্রে কিছু দান কর তাহা হইলে আমার চরম কৃতার্থতা আসে কিন্তু পরম উদাসী দিব্যজীবন শ্রীরাধারমণের সেদিকে এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ নাই।

তেমনি পরিবেশে সেদিন আসিয়াছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত শীল পরিবারের ৺মতি শীল মহাশয়ের পৌত্রবধূ ৺কুমুদিনী দাসী। কতবার প্রার্থনা করিলেন শ্রীরাধারমণের চরণসরোজ। একবার বলুন কোন মঠের জন্য এ দীনের সামান্য অর্থও গৃহীত হবে। কিন্তু সেদিন করুণাময় শ্রীরাধারমণ শুধু বলিয়াছিলেন—

"সময়ে দরকার হবে, মহাপ্রভুর কোন বিশেষ কাজ তোমার দ্বারা একদিন হবে, তবে তিনটি কথা—

(১) হয়ত সামান্য অর্থের প্রয়োজন।

(২) তোমার অর্থের অভাব নেই।

(৩) কি কাজ পরে বলবো।

কুমুদিনী দাসীর জীবনে আশার সঞ্চার হয়েছিল; কিন্তু তখনই তাহার পূর্ণতা হয় নাই।

সেদিন প্রসঙ্গটি আলোচিত হইয়াছিল এক নিভৃত স্থান পুরীর মঙ্গু মঠের প্রাঙ্গণ দ্বারে। বরদান ঘটিয়াছিল মৌন মহাকালের একটি শুভক্ষণে। শ্রীরাধারমণ সেবা গ্রহণ করিবেন আর কুমুদিনী দাসী সেবা করিবেন। এই শ্রুতি প্রতিশ্রুতিই সেদিন কুমুদিনীর স্মৃতিতে রহিয়া গেল, তৃতীয় কেহ জানিল না। সেদিনের একথা পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীপাদ শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের কর্ণগোচর হয় নাই। কারণ বিখ্যাত ধনী পরিবারের কুলরমণীর কাছে সেকথা শুনিবার বা তাঁহার দাক্ষিণ্যের ব্রত ঘোষণা করিবার অবসরও ছিল না; তাঁহার বিরাট এষ্টেটের বৈষয়িক ব্যাপারে ভিখারী বৈরাগীদের সামান্য ভিক্ষার প্রয়োজনেও তাঁহার নিকট কাহারও যাতায়াত ছিল না। অতএব উহা শীল বধূর স্মৃতিতেই থাকিতে পারে এবং তাহাই ছিল।

কালক্রমে পরমারাধ্য শ্রীরাধারমণ প্রকটলীলার সম্বরণ করিয়া দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন। পুরীর হরিদাস মঠ এবং শ্রীরাধারমণের পার্ষদগণ যাঁহার যেখানে অবস্থান তাঁহারা সেইখানেই রহিলেন। সবার উপর রহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর আর শ্রীহরিদাস আর তাঁহার চরণরেণু পূত দিব্যধাম তুল্য পুরীধামের চিহ্নিত স্থানগুলি।

এদিকে মঠের ভূমির মালিক হিসাবে সেই গোস্বামী সন্তানটির মঠ সংক্রান্ত ঋণের মাত্রা বাড়িতে বাড়িতে ২৮০০ টাকায় টোটা গোপীনাথসহ হরিদাস মঠটি বাঁধা পড়িয়া গেল। আর অল্পদিন পরেই উহার চূড়ান্ত সমাধা নীলামে বিক্রয়ের।

মঠটি কিসে রক্ষা পাইবে, কি উপায়ে ঐ পবিত্র ভূমি ও পীঠস্থান এবং সেবিত বিগ্রহ রাজির সেবায় বজায় থাকিবে, কি উপায়ে বিগ্রহসেবার দৈন্য ঘুচাইয়া তাহার উজ্জ্বল সংস্কার সাধন করা যাইবে, সে দৃষ্টি গোস্বামী সন্তানের সম্ভবই ছিল না। শ্বশুর রঘুনাথ গোস্বামী মহাশয় সব কিছু জানিয়া বুঝিয়া দেখিয়া শুনিয়াও নিরুপায়। তাঁহার শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা এবং কীর্ত্তনমহোৎসবে সাহায্য সর্ব্বদাই ছিল। সেই আভ্যাসেই তিনি বাৎসরিক

হরিদাস উৎসব করিবার জন্য শ্রীবাবাজী মহারাজকে "হরিদাস মঠেই" সে কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু উৎসাহ দান ও বিঘ্ন অপসারণ যেমন এক কথা নয়, তেমনি উহা একটি একক শক্তিরও কাজ নয়। সেইজন্য মঠের বাৎসরিক উৎসবটি সম্পন্ন করিবার মধ্য পথেই মঠের অধিকার রক্ষার শঙ্কা ও জাগিদ গোস্বামীজীর জামাতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সেক্ষেত্রে রঘুনাথ গোস্বামী সম্ভবমত শক্তি দেখাইয়াও জামাতার সম্পদ বিপত্তিকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে এ মঠটি অল্পদিনেই নীলাম হইয়া যাইবে। সেইজন্য মঠের ঋণদাতাও কালক্ষেপ করিয়া আর কেন বাবাজীদের এই উৎসব কীর্ত্তন প্রভৃতি কার্যকলাপ সহ্য করিবেন? এদিকে সাধারণ বৈষয়িক ব্যাপার হইলেও বা বাবাজী বৈরাগীরা এক্ষেত্রে নিরুদ্বেগ ও নিস্পৃহ হইয়া সরিয়া আসিতে পারেন কিন্তু হরিদাস মঠ যে কি ভূমি তাহা শ্রীনিতাই শ্রী গৌরাঙ্গের করুণা ভিখারী শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের অনুভূতিবেদ্য। অপরপলে নামময়মূর্তি শ্রীহরিদাসই যাঁহার মনোগগনে ধ্রুবনক্ষত্রের মত স্থির হইয়া আছেন সেক্ষেত্রে তিনি ঐ সময় (বাংলা ১৩১৪ সাল) একবার নিস্পৃহ হইয়া সরিয়া থাকিবেন কিরূপে? মাত্র ঐ কয়টি টাকার ঋণের দায়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পবিত্র ভূমিটির ঐরূপ দীনতাতাঁহার প্রাণে অন্যদিক দিয়া সাড়া জাগাইয়া দিল। কিন্তু যাঁহার জীবন কঠোর বৈরাগ্যের ভিত্তিতে গড়া কিরূপে ঐ অর্থ সংগ্রহের জন্য নিজেকে ব্যাপৃত করিতে পারেন? অথচ কে যেন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। তাই জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা গোবিন্দ দাস ও বলরাম দাসের পরামর্শে সেই গোস্বামীকে মাত্র একুশ দিনের জন্য অল্প কিছু অর্থের বিনিময়ে একটি বাক্‌পত্র লিখিয়া দিয়া একাকী কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মনের বল রহিল শ্রীগুরু আদিষ্ট নামব্রহ্মের ভূমি রক্ষা। অ-ভাবের সঙ্গ যিনি কখনও করেন নাই তাঁহারও সেদিন অভাববোধের প্রশ্নই জাগিতে লাগিল। উহাও অদৃশ্য শক্তির কৃপাবিভূতি।

কিন্তু ভাবরাজ্যের যিনি ভূপতি তিনি বস্তুরাজ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখেন, আর্থিক বিপননীতে অর্থের লেন-দেন হয়, আর পরমার্থেরও যে বিপণী আছে সেখানেও সেই পারমার্থিক সম্পদের লেন-দেন হয়। উভয়ের ক্ষেত্র আলাদা; ভূমি সংরক্ষণ হইল বৈষয়িক ব্যাপার। সে ব্যাপার বিষয়ী ব্যক্তিরা ভাল বুঝে। কিন্তু পুরীধামের হরিদাস ঠাকুরের মঠের প্রতি সাধারণের যদি পারমার্থিক বোধই

থাকিবে তবে গোস্বামী সন্তানের ক্ষেত্রে তাহা প্রাকৃত সম্পদের জ্ঞান এবং ঋণের ঘটনা ঘটিবে কেন? সব কিছু বুঝিয়াও সেই শক্তির হস্তক্ষেপে শ্রীবাবাজী মহাশয় উদাসীর উন্মত্তভাবে ডুবিয়া গেলেন। কলিকাতার পরিচিত অর্দ্ধপরিচিত ধার্মিক ও বিত্তমানশালীদের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াও কিন্তু সেদিন এতটুকুও প্রতিশ্রুতি বা ইঙ্গিত পাইলেন না যে, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যটির জন্য মাত্র তিন হাজার টাকার অল্প অংশের ভারও কেহ গ্রহণ করিবেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হইল। কিন্তু সে আবেদনের প্রতি কাহারও যে দৃষ্টিপাত হইয়াছে তেমন সাড়াও পাইলেন না। মনের গতি স্তব্ধ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বারচৌদ্দ দিনও কাটিয়া গেল। বিষণ্ণমন আরও খিন্ন হইল। স্নানাহার যেন নৈমিত্তিক কান্ড মাত্র হইয়া রহিল। কোনও দিন কলিকাতা, কোনও দিন বরাহনগরে আসা যাওয়া চলিতে লাগিল। গৃহস্থ ও বৈরাগী গুরু ভ্রাতারা তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিয়াও কিছু নূতন পথের ইঙ্গিত দিতে পারিলেন না। মনের প্রগাঢ় সংকল্পটি যেন মনের স্নায়ুগুলিকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গকে কম্পিত করিতে লাগিল। ক্রমে সেই সংকল্প আরও তীক্ষ্ম হইয়া উঠিল কুঠিঘাটে আসিয়া গঙ্গাস্নানের পর। অচ্যুতচরণচ্যুতা গঙ্গাবারির স্নেহস্পর্শ যেন তাঁহাকে বলিয়া দিলেন এই সংকল্প সিদ্ধ না হইলে আর জলগ্রহণ করা যায় না।

বাবাজী মহাশয় সেই সংকল্পে অবিচলচিত্ত হইয়া হাঁটিয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঢাকা পটির গুরুভ্রাতা হীরালাল দত্তের বাড়ীতে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া অন্যতম গুরুভ্রাতা অতীন্দ্র বসুর বাড়ী আসিলেন। ইনি মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লকে অন্যতম নেতা ভূতপূর্ব্ব এম এল এ অমর বসুর পিতা, বসু মহাশয় একান্তভাবে শ্রীগুরুনিষ্ঠচিত্ত, শ্রীবাবাজী মহারাজের ঐকান্তিক মনোভাবে বিচলিত হইয়া বলিলেন, দাদা, যার ভাবনা তিনি করবেন? তোমার কেন? ও তো শ্রীগুরু গৌরের কাজ, তাঁদের জিনিষ হরিদাস।

শ্রীবাবাজী মহারাজ চমকিত হইলেন আজিকার সংকল্পের ইহাই সিদ্ধি দেখিয়া এবং এ সংকল্পের ইহাই উপরের আদেশ মনে করিয়া, তাঁহার সত্ত্বসঞ্জাত মনটি সত্ত্বের বিভূতিতে পূর্ণ হইয়া গেল। গুরুভ্রাতার আগ্রহে প্রসাদী সরবত মাত্র গ্রহণ করিয়া চাঁপাতলায় আর এক গুরুভ্রাতা বিহারী দাসজীর আবাসে গমন করিলেন। অচিরেই এক অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত হইল।

কাহার প্রেরণায়, কাহার করুণাস্পর্শে, কাহার প্রাণে কে সাড়া জাগাইয়াছে, কে বুঝিবে তখন ? সেই সময় মতিলাল শীল মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীর পূজারী আসিয়া বলিলেন "গিন্নীমা দেখা করতে বলেছেন।" বিহারী দাসজীর মুখে শুধু হাসি ফুটিল। শ্রীবাবাজী মহাশয় বোধ হয় সেই সময় একটি অলক্ষ্য স্বয়ুপের স্পষ্ট ডাকই শুনিলেন।

কলিকাতার প্রখ্যাত বাঙ্গালী ধনীদের শীর্ষস্থানীয় ধনী স্বর্গীয় মতিলাল শীল, তাহারই পৌত্রবধূ বিহারী দাসজীকে দেখা করিতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

কোথায় ধনবান্ সুবর্ণ বণিক শীলবাড়ী, আর কোথায় ঐহিক সম্পদহীন শ্রীরামদাস! কোন যোগও খুঁজিয়া পাইলেন না। গুরুভগ্নীও নন তিনি। তবে বৈষ্ণবতার সম্পর্ক আছে বটে, খড়দহের গোস্বামী পরিবারের দীক্ষিতা তিনি; লোক দিয়া অথবা সহানুভূতি কামনার চিঠি দিয়া, কিম্বা সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তির টুকরা পাঠাইয়াও তো তাহার কাছে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠের জন্য কোন সাহায্যের কথা জানান হয় নাই। তবে কিসের জন্য এই ডাক ?

শ্রীবিহারী দাসজীকে সঙ্গে লইয়া পরদিন তিনি শীলবাড়ী যাইবেন একথা পূজারীকে জানাইয়া দিলেন।

চিন্তা আর চিন্তামণি, মহতের স্পর্শ আর প্রস্তরের যোগ সবই মানববুদ্ধির অগোচরেই ঘটে। শ্রীবাবাজী মহারাজের চিন্তায় চিন্তামণির স্পর্শ তেমনি করিয়া অবিতর্কে ঘটিয়া গেল। রাত্রি কাটিল নিয়মিত ভজননিষ্ঠায়, পরদিবস সময়মত শীলবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বিহারী দাসজী, শীল গৃহিণী নীচে নামিয়া আসিলেন।

শীলতার একান্ত গৃহিণীই ছিলেন কুমুদিনী। প্রণাম বন্দনার পর শীলবধূ সেদিন প্রস্তাব করিলেন, "এ বাড়ীতে নামকীর্ত্তনের প্রসঙ্গে আপনি কাল বৈকালে আসুন আপনার সঙ্গীদের নিয়ে, বড় রোগ জ্বালার কোপ চলেছে এ বাড়ীতে।"

তাহাই হইল প্রথমদিনের রাত্রি, দ্বিতীয় দিনের দ্বিপ্রহর ও রাত্রিতেও কীর্ত্তন প্রসঙ্গ আর প্রসাদ গ্রহণ। তৃতীয় দিনের কীর্ত্তনের অন্তে দোলমণ্ডপে শীল গৃহিণী আত্মপরিচয় দিলেন—আমি গরীবের মেয়ে ধনী ঘরে এসেছি, এ জীবনে নিজের হাতে পঞ্চাশটি টাকাও কাউকে দিতে পারিনি, চারিটি পয়সা খরচ করতে ইচ্ছে হলেও এই এষ্টেটের এক্‌জিকিউটর বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। পুরী গিয়েছিলেম কয়েকবছর আগে, দীক্ষা আমার খড়দহে। তবুও—পুরীর ড়ব

বাবাজী মহাশয় আমাকে অহেতুক করুণায় কিনে নিয়েছিলেন। তাঁর সেবায় অর্থ দিতে চাইলাম। হেসে বলেছিলেন—থাক্ সময়ে দরকার হবে। সেদিন আর হঠতা করতে পারি নি। আমায় কথা দিয়েছিলেন, কলকাতায় গেলে তোমার বাড়ী যাব।

'থাক্ সে সব কথা, দাদা এখন শোনো—আজ দুদিন স্বপ্নে দেখ্ছি—সেই রূপ সেই দীঘল মূর্ত্তি, সেই অপরূপ আকর্ষণের লাবণ্যময় পুরুষ আমাকে বলছেন "তোমায় কাজ করতে হবে, সময় এসেছে, তোমার রামদাদা আসবেন তোমার বাড়ীতে, তার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ কর। যা বলেছিলাম তারই দিন এসেছে।" শীলবধূ "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াই অশ্রুসজল নেত্রে ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীবাবাজী মহারাজের চরণপ্রান্তে প্রণতা হইলেন।

শ্রীবাবাজীমহারাজের দেহ কম্পিত হইল। অন্য এক ভাবনায়ও তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। সে ভাবনা শ্রীগুরুদেবেরই অভীষ্ট কার্য্য করিতে যাইয়া ব্যক্তি, গোষ্ঠী আর বিষয়ীর কাছে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠের উদ্ধার সাধনের বাসনা, এতো তাঁহারই কাম্য, তাঁহারই কার্য্য। এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া কেন সময় নষ্ট করিলাম। মহাপ্রভুর প্রিয় হরিদাস তাঁহার ভূমির উদ্ধার সাধন মহাপ্রভুই করিবেন। উহাও তো বাহ্য, আরও ভিতরের রহস্যে বসিয়া আছেন শ্রীগুরুদেব। কে গৌর কে তাঁর দাস, কিবা তাদের কাজ? এ সবের হিসাব শ্রীগুরুদেব ছাড়া কে জানাইয়াছেন?

এই সূত্র স্মরণের অনুভূতিতে শ্রীবাবাজী মহাশয় মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইতে লাগিলেন। তেমনি স্তব্ধ কাতর দৃষ্টিতেই চাহিয়া রহিলেন শীল গৃহিণীর দিকে। শীলগৃহিণীর মুখে শ্রীগুরুদেবের স্বপ্নমূর্তির দর্শনদান ও স্বপ্নশ্রুত বাণীগুলি শুনিয়া তখনও যেন সেগুলি তাঁহার কাণে বাজিতেছে। পুলকে তাহার শরীর ভরিয়া গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শীলগৃহিণী বলিলেন, দাদা! বলুন কি তাঁর কাজ করতে হবে,? বাবাজী মহাশয় বুঝিলেন আমার আসার কথাও শ্রীগুরুদেব ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। বাকী শুধু বৈষয়িক হিসাবটুকু।

আরব্ধ সংকল্পটি সংক্ষেপে বলিলেন, শীল-গৃহিণী সবই শুনিলেন। তাহার পরই বলিলেন, দাদা! আজকের কোন কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কানে না যায়। এই তো দুর্গাপূজা ফুরালো, লক্ষ্মীপূজার আগেই আমরা পুরী যাচ্ছি।

কি যে ঘটিল কেহ জানিল না। সূত্রের গ্রন্থি যেমন ভীষণ শক্ত হইয়া আসিয়াছিল তেমনি লঘু হইয়া খুলিয়াও গেল। প্রসন্নগম্ভীর মুখে শ্রীবাবাজী মহারাজ বিহারী দাসজীর আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। পুরীতে সংবাদ পাঠাইলেন শ্রীগোবিন্দ দাসজীকে।

যথাসময়ে শীলগৃহিণী পুরীতে আসিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠের উদ্ধার কার্য্যটি যাহা মাত্র তিন হাজার টাকার ব্যাপার, তাহার দলিল রেজিষ্ট্রি হইতে যাবতীয় কাজ শ্রীরাধারমণ এমনভাবে গুছাইয়া গুছাইয়া সম্পন্ন করিলেন সবই যেন পূর্ব্বসংকল্পের লেখাজোখা হইয়া মঞ্জুষায় ভরা ছিল। শুধু কাজের ভার বাঁটিয়া দিয়া প্রত্যেককে শ্রীহরিদাসের মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করার কাজ বাকী ছিল, তাহাও সুসম্পন্ন হইল।

এ মঠ বিশ্বের অখিল মানবের এবং সমস্ত প্রাণীর জন্য আজও জাগ্রত রহিয়াছে। অলক্ষ্যে নামময় মূর্ত্তি শ্রীহরিদাস অনন্তকালের জন্য তাঁহার প্রাণের প্রাণ শচীদুলাল শ্রীগৌর সুন্দর আর তাঁহার গণকে লইয়া শ্রীহরিনামের রোল তুলিতেছেন। শ্রীরাধারমণও তাহার গণ লইয়া নিতাই গৌর সীতানাথের পার্ষদ ও সহচর বৃন্দের পার্শ্বে আসিয়া স্থান লইয়াছেন। প্রহরীর কার্য্যভার অর্পিত হইয়া আছে শ্রীপাদ **শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের** হস্তে।

———